Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 66
April-June 2021

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় 'উশর ও খারাজ : একটি তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পর্যালোচনা

'Ushr and Kharaj in the Land Management of Bangladesh: A Theoretical and Empirical Analysis

Zubair Mohammad Ehsanul Hoque*

ABSTRACT

Zakat is the third pillar of Islam. Zakat of fruits and crops is called 'ushr. There exists little discussion and awareness about 'ushr in Bangladesh. It is generally thought that the land of Bangladesh is kharājī; therefore, it is not necessary to collect zakat off agricultural production in this country. However, in the light of the evolution of land management in Bengal, it may be said that the idea is not entirely true. This article reviews the land management system of Bangladesh from the first Muslim conquest of this land to the modern age. It shows that Bengal has a significant amount of 'ushri land' along with kharājī one. However, during the British period, the kharāj system was abolished and its reintroduction would be unnecessary and impossible. In this situation, the strong recommendation of this essayist is that 'ushr should be collected from the production of agricultural land in Bangladesh irrespective of its kharājī and 'ushrī classification.

Keywords: 'Ushr; Kharaj; Land Management; Land rent; Land Tax

সারসংক্ষেপ

ইসলামের তৃতীয় রুকন যাকাত। ফল ও ফসলের যাকাতকে 'উশর বলা হয়। বাংলাদেশে 'উশর সম্পর্কে আলোচনা ও সচেতনতা কম। সাধারণত মনে করা হয়, বাংলাদেশের জমি খারাজী; তাই এই দেশের কৃষিজ উৎপাদনের যাকাত আদায় করা অপরিহার্য নয়। তবে বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তনের আলোকে বলা যায়, ওই ধারণা আংশিক সঠিক। প্রথম মুসলিম বিজয় হতে শুরু করে আধুনিক কালের ভূমি ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করে এ প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশে খারাজী

* Dr. Zubair Mohammad Ehsanul Hoque is a Professor, Department of Arabic University of Dhaka, email: zubairehsan@du.ac.bd.

ভূমির পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ 'উশরী জমি রয়েছে। তবে ইংরেজ আমলে খারাজ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছে এবং তার পুনঃপ্রবর্তন অপ্রয়োজনীয় ও অসম্ভব। এমতাবস্থায় এই প্রবন্ধকারের জোরালো সুপারিশ এই যে, খারাজী-'উশরী নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল কৃষি জমির উৎপাদন হতে 'উশর আদায় করা উচিত।

মূলশব্দ: 'উশর, খারাজ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, খাজনা, ভূমি কর।

ভূমিকা

ইসলামের তৃতীয় রুকন যাকাত। জমিতে উৎপাদিত ফসলের যাকাতকে 'উশর বলা হয়। প্রতি বছর রমযান মাসে আমরা যাকাত আদায়ের কার্যক্রম দেখতে পাই। কিন্তু 'উশর সম্পর্কে খুব বেশি আলোচনা হয় না; ফসল কাটার মৌসুমে আমরা সাধারণত 'উশর আদায় করতে দেখি না। এর হেতু জানতে হলে বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাস জানা দরকার। বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পর বিজিত বাসিন্দাদের নিজেদের ভূমিতে বহাল রেখে খারাজ (ভূমিকর) আরোপ করা হয়েছিল। এদেশের মুসলিমরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী। এই মাযহাব মতে খারাজী জমির উৎপাদন হতে 'উশর আদায় করতে হয় না।

এই সাধারণ অনুসিদ্ধান্তের ব্যাপারে দু'টো পর্যবেক্ষণ উত্থাপন করা যায়: (১) প্রথম মুসলিম বিজয়ের সময় বিজিত বাসিন্দাদেরকে তাদের জমিতে বহাল রাখার পরও বাংলার বিস্তীর্ণ ভূমি অনাবাদী ও পতিত অবস্থায় ছিল, যা পরবর্তীকালে সরকারী কর্মচারী, সৈনিক, অভিজাত ব্যক্তিসহ নানা শ্রেণির মানুষের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়। এই শ্রেণির ভূমি খারাজী নয়। তাছাড়া মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলায় যে অল্প সংখ্যক মুসলিমের বসবাস ছিল, তাঁদের জমিও 'উশরী। (২) বাংলায় নিরবচ্ছিন্নভাবে মুসলিম শাসন চালু ছিল না। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় দুই শত বছর ইংরেজরা এ দেশ শাসন করেছে। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে খারাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালে ইংরেজদের বিদায়ের পর ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বাংলাদেশে মুসলিম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও ভূমি ব্যবস্থাপনায় খারাজ পুনঃপ্রবর্তিত হয়নি। এমতাবস্থায় খারাজী ভূমির দোহাই দিয়ে 'উশর প্রদানের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাওয়া যাবে কি?

এই প্রবন্ধে আমরা উপর্যুক্ত প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছি। আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে মূল প্রবন্ধকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে 'উশর ও খারাজের সংজ্ঞা ও বিধানাবলি এবং 'উশরী ও খারাজী জমির পরিচয় অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে মুসলিম বিজয় হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক 'উশরী ও খারাজী হওয়ার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ভূমির প্রকৃতি ও শ্রেণি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই প্রবন্ধ অধ্যয়নে পাঠকগণ বাংলাদেশের কৃষিজ উৎপাদনের ওপর 'উশরের বিধান প্রয়োগের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

ইতঃপূর্বে সম্পাদিত গবেষণাকর্ম, বর্তমান রচনার যৌক্তিকতা ও গবেষণাপদ্ধতি

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় 'উশর ও খারাজ সম্পর্কে খুব বেশি গবেষণামূলক বই/প্রবন্ধ রচিত হয়নি। আলোচ্য বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত/অনূদিত রচনাগুলোর মাঝে দু'টো বইয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়: (১) পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর উপমহাদেশের প্রখ্যাত 'আলিম মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. ওই দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা নিয়ে উর্দু ভাষায় একটি বই রচনা করেন। সেই সময় বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকায় এদেশের ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনায় বইটি কিছুটা প্রাসঙ্গিক। ১৯৮৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ *ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা* শিরোনামে বইটি বাংলায় অনুবাদ করে। মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. ভারতে মুসলিমদের বিজয়ের ইতিহাস উপস্থাপন করে উপমহাদেশের জমি খারাজী না 'উশরী তা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের জমি 'উশরী জমি। চিহ্নিত করা সম্ভব হলে এই জমিগুলোর উৎপাদন হতে 'উশর আদায় করতে হবে। অবশিষ্ট ভূমি হতে খারাজ আদায় করতে হবে। সরকার যে খাজনা ট্যাক্স আদায় করে তা যদি খারাজের সর্বনিম্ন পরিমাণ তথা উৎপাদনের ২০% এর চেয়ে কম হয় তাহলে যেটুকু কম সে পরিমাণ খারাজ ব্যক্তিকে নিজ উদ্যোগে হকদারের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে।

(২) ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ* শিরোনামে একটি বই রচনা করেছেন। তিনি 'উশর ও খারাজের বিস্তারিত বিধান উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশের ভূমিতে তা প্রয়োগের সম্ভাব্য উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ইংরেজ শাসনের সময় বাংলাদেশে খারাজ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটেছে। এটির পুনঃপ্রবর্তন নিষ্প্রয়োজন, অসম্ভবও বটে। তাই 'উশরী ও খারাজী জমির বিভাজন না করে মুসলিম-মালিকানাধীন সকল জমির উৎপাদন হতে 'উশর বা অর্ধ-'উশর ফসলের যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে।

আমাদের গবেষণার ফলাফল অভিনব বা ব্যতিক্রমী নয়। তবে শর'ঈ বিধান প্রয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ভূমির প্রকৃতি নির্ণয়ে এই ভূখণ্ডের ভূমি ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক বিবর্তন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পূর্বোক্ত বই দু'টিতে এই দিকটির ওপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করা হয়নি। সেই শূন্যতা পূরণের চেষ্টায় এই প্রবন্ধে আমরা বাংলায় মুসলিমদের বসতি স্থাপনের আদি বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক সূত্রের আলোকে অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছি। অতঃপর মুসলিম বিজয়ের সূচনা হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থাপনার আলোকে বাংলাদেশের ভূমি 'উশরী না খারাজী তা নির্ণয় করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধ রচনায় বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণাটি জ্ঞানের বহুবিধ শাখার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় বৈচিত্র্যময় তথ্যসূত্রের সহায়তা নেয়া হয়েছে। 'উশর ও খারাজ সম্পর্কিত আলোচনার জন্য কুরআন, হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থ হতে তথ্য নেয়া হয়েছে। বাংলায় মুসলিমদের বসতি স্থাপন ও বিজয়ের বিবরণের জন্য প্রাচীন আরব পরিব্রাজকদের ভ্রমণবৃত্তান্তসহ অন্যান্য

ঐতিহাসিক সূত্রের সহায়তা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া ভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থাবলিও গবেষণা সম্পাদনে ব্যবহৃত হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার্থে প্রবন্ধটি দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে 'উশর ও খারাজের সংজ্ঞা এবং 'উশরী ও খারাজী ভূমির পরিচয় তুলে ধরা হবে।

'উশর ও খারাজ: প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি

'উশর

ইসলামের অন্যতম রুকন যাকাত। এটি সাধারণ পরিভাষা। প্রকার-প্রকৃতি ও ধরন নির্বিশেষে যে-কোনো সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণ হতে নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ সুনির্দিষ্ট খাতে দান করাকে সাধারণভাবে যাকাত বলে। তবে বিশেষ সম্পদের যাকাত বোঝাতে বিশেষ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ একটি পরিভাষা হল 'উশর, এটি আর্থিক ইবাদাহ যাকাতেরই একটি বিশেষ রূপ।

عَشْر হতে 'উশর (عُشْر) উদ্ভূত। عشر-এর অর্থ হল দশ, আর 'উশর-এর অর্থ হল দশ ভাগের এক ভাগ বা এক-দশমাংশ। মুফতি 'আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দিদী আল-বারাকাতী-এর ভাষায় 'উশর হল:

> واحد الأجزاء العشرة أو نصفه يؤخذ من الأرض العشرية.
>
> (ফসলের) এক দশমাংশ বা তার অর্ধেক, যা 'উশরী জমির (উৎপন্ন ফসল) হতে আদায় করা হয় (Al-Barakatī 2003, 147)।

ফল-ফসলের যাকাতের ক্ষেত্রে এই পরিভাষা চালু হওয়ার কারণ হল, সাধারণত উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ (১০%) যাকাত হিসেবে আদায় করতে হয়। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধ-'উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) আদায় করতে হয়। তবে অধ্যায় শিরোনামের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিভাষা তথা 'উশর শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

'উশরের প্রকারভেদ

আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ বিবেচনায় 'উশর দুই প্রকার: (ক) 'উশর বা এক দশমাংশ, (খ) অর্ধ-'উশর বা বিশ ভাগের এক ভাগ (৫%)।

'উশর (১০%): বৃষ্টি বা নদ-নদীর পানি দ্বারা যে জমি সিক্ত হয় বা যে জমিতে উদ্ভিদ শিকড় দিয়ে মাটি হতে রস টেনে নেয় (অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে সেচ দিতে হয় না) সেটির উৎপাদিত ফসল হতে ১০% যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে।

অর্ধ-উশর (৫%): যে জমিতে পানি বহনকারী পশু, বড় বালতি বা কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে সেচ দেওয়া হয় সেটির উৎপন্ন ফসল হতে অর্ধ-'উশর তথা বিশ ভাগের এক ভাগ (৫%) যাকাত আদায় করতে হবে।

'উশর ও অর্ধ–'উশর-এর দলীল

আল-কুরআনুল কারীমের আয়াতের মাধ্যমে ফসলের যাকাত ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ

তোমরা ফসল কাটার দিন তার হক আদায় কর (Al-Qurān, 6:141)। তবে 'উশরের নিসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিধান হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

ক. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ .

'যে জমি বৃষ্টি বা ঝরনার পানিতে সিক্ত হয় কিংবা যে জমিতে উদ্ভিদ শিকড় দিয়ে রস টেনে নেয় তাতে 'উশর (১০%) এবং যাতে পানিবহনকারী পশু দ্বারা সেচ দেয়া হয় তাতে অর্ধ-'উশর (৫%) (Al-Bukhārī 2001, 1:358)।

খ. উপর্যুক্ত হাদিসটির আরেকটি সংস্করণ নিম্নরূপ:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي، أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

যে ভূমি বৃষ্টি, নদ-নদী ও ঝরনার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় অথবা এমন ভূমি যা স্বাভাবিকভাবে তলদেশ থেকে আপনা আপনিই সিক্ত হয়, তাতে 'উশর (১০%) দেয়া ওয়াজিব। আর যে ভূমি পশু অথবা বড় বালতি বা কোনোরূপ সেচ যন্ত্রের দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তাতে 'উশরের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে (Abū-Dāūd 2007, 2: 468)।

সারকথা হল, প্রাকৃতিক উপায়ে যদি জমি সিক্ত হয় এবং সেচ বাবদ কৃষকের অর্থ ব্যয় করতে না হয়, তাহলে সে জমির উৎপন্ন ফসল হতে ১০% যাকাত দিতে হবে। আর কৃত্রিম উপায়ে জমিতে সেচ দেয়া হলে অর্থাৎ সেচের জন্য কৃষককে ব্যয় করতে হলে সে জমির উৎপন্ন ফসল হতে ৫% যাকাত দিতে হবে।

'উশর সম্পর্কিত আরো কিছু মাসআলা আছে। যেমন, 'উশর ফরয হওয়ার জন্য উৎপাদিত ফসলের কোনো পরিমাণ বা নিসাব নির্ধারিত আছে কি? কোন্ কোন্ ধরনের ফসলের ওপর 'উশর ফরয হয়? 'উশর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেচের খরচ ব্যতীত অন্যান্য খরচ বাদ দেওয়া হবে কিনা? এসব বিষয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করার সুযোগ নেই। ফিকহ-এর গ্রন্থাবলি ও সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধাদি অধ্যয়ন করা যেতে পারে (Hoque 2020)।

এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হল বাংলাদেশের ভূমি 'উশরী না খারাজী তা নির্ণয় করা। অতএব 'উশরী ও খারাজী ভূমির পরিচয় উপস্থাপন করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

'উশরী ভূমির পরিচয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সমগ্র আরব উপদ্বীপ হতে শিরকের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বহু আরব গোত্র দলে দলে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। তাছাড়া আরবদেরকে কুফর অবস্থায় বহাল থাকার সুযোগ দেয়া হয়নি। তাই পুরো আরব উপদ্বীপের ভূমি উশরী ভূমি হিসেবে পরিগণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর আরব ভূমির বাইরে বিজয়াভিযান সম্প্রসারিত হয়। এক পর্যায়ে ইরাক জয়ের পর বিজিত ভূমি যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করে দেয়ার আবেদন করা হয়।

তখন 'উমার ইবনুল খাত্তাব রা. শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণের পরামর্শে বিজিত ভূমি যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন না করে স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে বহাল রেখে তাদের ওপর খারাজ আরোপ করেন। তখন হতেই মুসলিম জগতের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় খারাজী ভূমির বিধান সংযুক্ত হয়। পরবর্তীকালে খলীফাগণের কর্মপন্থার আলোকে মুজতাহিদ 'আলিমগণ উশরী ও খারাজী জমির প্রকৃতি ও বিধান প্রণয়ন করেন। উশরী ভূমি নির্ধারণের মূলনীতি নিম্নরূপ:

১. সমগ্র আরব ভূখণ্ড 'উশরী ভূমি। আরব ভূখণ্ডের পরিচয় দিতে গিয়ে *আল-হিদায়াহ* গ্রন্থাকার বলেন,

وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام

'আরব ভূমি বলতে বোঝায় আল-উযায়ব[১] হতে একদিকে ইয়েমেনের পাথুরে এলাকার শেষ প্রান্ত তথা মাহরা পর্যন্ত, অপরদিকে শাম[২]-এর সীমান্ত পর্যন্ত।' রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফা রাশিদুন এই ভূখণ্ডে খারাজ আরোপ করেননি। কারণ খারাজ আরোপের ক্ষেত্রে শর্ত হল, অধিবাসীদের কুফর-এর ওপর বহাল থাকার সুযোগ দেয়া। আরব ভূমির মুশরিকদেরকে সেই সুযোগ দেয়া হয়নি। অতএব, এটি 'উশরী জমি (Al-Marghīnānī 1417 H., 4 : 302-3; Al-'Ainī 2000, 7 : 220-21)।

২. স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণকারীদের ভূখণ্ডও 'উশরী জমি। এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন,

إذا أسلم أهل مدينة من مدائن أهل حرب قبل ظهور المسلمين كانوا أحرارا لا سبيل عليهم ولا على أولادهم ولا على أموالهم ويوضع على أراضيهم العشر دون الخراج .

আহলুল হারব-এর কোনো শহরের বাসিন্দারা যদি তাদের ওপর মুসলমানদের জয়লাভের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারা স্বাধীন বলে পরিগণিত হবে এবং তাদের ও তাদের সন্তানসন্ততি ও ধনসম্পদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাদের ভূমিতে খারাজ নয়, 'উশর আরোপ করা হবে (Al-Thanovi, ND. 12)।

এ প্রকারের জমি 'উশরী হওয়ার কারণ হল, ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মুসলিমদের সংশ্লিষ্ট হওয়ার শুরুতেই জমি মালিকরা মুসলিম ছিল; আর মুসলিমের ওপর খারাজ আরোপ করা যায় না (Sarakhsī, ND. 3 : 7)। খারাজের ক্ষেত্রে হীনতার ভাব আছে, পক্ষান্তরে 'উশরে রয়েছে ইবাদাহ-এর চেতনা (Al-Kasānī 2003, 2:509)।

---

১. উযায়ব: কূফার অন্তর্গত একটি জনপদ।

২. প্রাচীন আরবের উত্তরে অবস্থিত বিস্তীর্ণ এক জনপদ। ভূগোলবিদ ইয়াকূত আল-হামাবী শাম-এর সীমানা চিহ্নিত করেছেন এভাবে: একদিকে ফুরাত হতে মিশর সীমান্তবর্তী আরিশ পর্যন্ত, অপরদিকে তাই পাহাড় হতে রোম সাগরের (ভূমধ্যসাগরের) তীর পর্যন্ত। শামের গুরুত্বপূর্ণ শহরের মাঝে রয়েছে: মানবিজ, হামা, হিম্স, হালব (আলেপ্পো), দামেশক ও বায়তুল মুকাদ্দাস (জেরুসালেম)। তাছাড়া সাগরের তীরবর্তী শহর আন্তাকিয়া (তুরস্কের এন্টিয়ক শহর), তারাবুলুস (লেবাননের ত্রিপলি), আক্কা (দখলদার ইসরাইলের Acre) এবং আসকালানও শামের অন্তর্গত (Yakūt 1977, 3:312)। অনেকে ভুলবশত আধুনিক যুগের সিরিয়া ও প্রাচীন শাম অভিন্ন মনে করেন। প্রাচীন যুগের শাম আধুনিক যুগের চার/পাঁচটি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন ফিলিস্তিন (দখলদার ইসরাইলসহ), জর্দান, সিরিয়া, লেবানন ও তুরস্কের অংশবিশেষ।

৩. যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত ভূখণ্ডের যে অংশ বিজয়ী যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করা হয়, সেটিও 'উশরী ভূমি হিসেবে পরিগণিত হবে; যেহেতু মুসলিম বিজয়ের শুরু হতেই এটি মুসলিমদের ভূমি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ইমাম শামসুদ্দীন আল-সারাখ্সী বলেন,

وكل بلدة افتتحها الإمام عنوة وقسمها بين الغانمين فهي أرض عشرية .

যেসব ভূমি শাসক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জয় করেন, তারপর বিজয়ী যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করেন, সেগুলো 'উশরী ভূমি (Al-Sarakhsī, ND. 3 : 7)।

বিজয়ের পর বিজিত ভূমি প্রথমেই মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করে দেয়ায় খারাজ আরোপের সুযোগ নেই। বরং ইবাদাহ-এর অর্থ থাকায় 'উশর ধার্য করাই যথার্থ; এ ছাড়া খারাজের তুলনায় 'উশরের পরিমাণ কম এবং প্রকৃত উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তা আদায় করা কিছুটা সহজসাধ্য (Al-'Ainī 2000, 7 : 223)।

৪. কোনো মুসলিম যদি রাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে পতিত জমি আবাদ করে তাহলে হানাফী ও মালিকী মাযহাব মতে তাও 'উশরী জমি বলে পরিগণিত হবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ) বলেন, আবাদকৃত জমি যদি 'উশরী জমির নিকটে হয়, তাহলে তা 'উশরী জমি বলে গণ্য হবে। আর খারাজী জমির কাছে হলে খারাজী ভূমি বলে বিবেচিত হবে। ইমাম আবু ইউসুফের যুক্তি হল, নৈকট্যের কারণে বিধান সম্প্রসারিত হয়। যেমন, বাড়ির আঙিনায় বাড়ির হুকুম প্রযোজ্য হয়ে থাকে। বাড়ির মালিক তা ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে। তেমনি বসতিপূর্ণ এলাকার নিকটে অবস্থিত অনাবাদি জমি দূরের কাউকে বরাদ্দ দেয়া যায় না। কারণ অনাবাদি জমি ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে কাছের লোকেরা অগ্রাধিকার পাবে। অতএব, অনাবাদি জমি আবাদের পর তার প্রকৃতি নির্ধারণে নিকটবর্তী জমির বিধান প্রযোজ্য হবে। তাঁর মতে, সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যে বাসরা 'উশরী ভূমি বলে পরিগণিত (Al- Marginānī 1417 H., 4 : 305-6; Al-Sarakhsī, ND. 3: 7-8; Al-Kasānī 2003, 2: 503)।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রাহ) বলেন, কোনো মুসলিম অনাবাদি জমি আবাদ করলে আবাদকৃত জমির প্রকৃতি ('উশরী / খারাজী) নির্ণয়ে চাষের কাজে ব্যবহৃত পানি বিবেচনায় নিতে হবে। অতএব আবাদকারী যদি 'উশরী পানি দ্বারা জমিতে সেচ দেয় তাহলে সেটি উশরী জমি বলে গণ্য হবে। উশরী পানি হল: (১) বৃষ্টির পানি, (২) আবাদকারীর নিজের খননকৃত কূপের পানি, (৩) নিজ পরিশ্রমে আবিষ্কৃত ঝরনার পানি, (৪) দিজলা, ফোরাত, সিহুন, জিহুন বা অনুরূপ ব্যক্তিমালিকানাহীন বড় নদীর পানি। অতএব এই প্রকারের পানি দ্বারা কোনো মুসলিম জমি আবাদ করলে সেটি 'উশরী জমি বলে বিবেচিত হবে। আর যদি খারাজী পানি দ্বারা অনাবাদি জমি আবাদ করে তবে তা খারাজী জমি বলে গণ্য হবে। খারাজী পানি হল: (১) অনারব দ্বারা খননকৃত খাল/নদীর পানি, যেমন বাদশাহ নওশেরার নদী বা বাদশাহ ইয়াজদাগির্দের নদীর পানি; (২) ঝরনার পানি, (৩) বায়তুল মালের অর্থে খননকৃত খালের পানি। অতএব এই ধরনের পানি দ্বারা জমিতে সেচ দেয়া হলে সেই আবাদকৃত জমি খারাজী

জমি বলে গণ্য হবে। কারণ জমির প্রবৃদ্ধি বা উৎপাদনের কারণে 'উশর বা খারাজ আরোপ করা হয়। আর প্রবৃদ্ধি হয় পানির মাধ্যমে। তাই খারাজী বা 'উশরী জমি নির্ধারণে ব্যবহৃত পানি বিবেচনায় নিতে হবে। তাছাড়া মুসলিমের ওপর প্রথমেই খারাজ আরোপ করা যায় না বলে সেচের কাজে ব্যবহৃত পানির ভিত্তিতে খারাজী বা 'উশরী নির্ধারণ যুক্তিযুক্ত (Al-Marghīnānī 1417 H. 4: 305-6; Al-Zuhailī 1985, 2: 821; Al-Sarakhsī ND., 3: 7-8; Al-Kasānī 2003, 2: 504)।

৫. মুসলিম যদি তার ভিটেবাড়ির কোনো অংশকে বাগিচায় পরিণত করে এবং তা 'উশরী পানি দ্বারা সেচ দেয়া হয়, তবে তা 'উশরী জমি বলে গণ্য হবে (Al-Kasānī 2003, 2: 503)।

৬. মসজিদ, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সীমান্ত পাহারার চৌকির জন্য ওয়াকফকৃত ভূমির উৎপন্ন ফসলে 'উশর ওয়াজিব হবে। শামসুদ্দীন আস-সারাখসী রহ. বলেন,

وكذلك الخارج من الأراضي الموقوفة على الرباطات والمساجد يجب فيها العشر عندنا.

তেমনিভাবে আমাদের মতে, প্রহরাচৌকি ও মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত ভূমির উৎপাদনের ওপর 'উশর ওয়াজিব হবে (Al-Sarakhsī ND., 3: 4-5)।

৭. লাখেরাজ জমিতেও 'উশর ওয়াজিব হবে।

'উশরী ভূমির বিধান

১. এই প্রকারের ভূমির শ্রেণিজ্ঞাপক পরিভাষা হতেই বোঝা যায়, 'উশরী ভূমির উৎপাদনের ওপর বিধিবদ্ধ বিধানের আলোকে 'উশর ওয়াজিব হবে।

২. 'উশর উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ফসল উৎপাদন না হলে 'উশর ওয়াজিব হবে না। আবার বছরে একাধিকবার ফসল উৎপাদন হলে প্রতিবারই 'উশর আদায় করতে হবে (Al-Marghīnānī 1417 H. 4: 312)।

২. 'উশরী ভূমিতে খারাজ আরোপ করা যাবে না। কোনো শাসক যদি 'উশরী জমিতে খারাজ আরোপ করে তাহলে তা বড় ধরনের জুলুম হিসেবে পরিগণিত হবে। জনগণের উচিত, নসিহা ও প্রতিবাদের মাধ্যমে এই ধরনের জুলুমের প্রতিবিধানের চেষ্টা করা।

৩। কোনো অমুসলিম 'উশরী জমি কিনলে তার ওপর 'উশর আরোপিত হবে না; কারণ 'উশর একটি ইবাদাত, অমুসলিম ইবাদত পালনে আদিষ্ট নয়। বরং তার ওপর খারাজ আরোপিত হবে। অবশ্য এ বিষয়ে ফকীহগণের মাঝে মতভেদ আছে।

খারাজ কি?

خراج বিশেষ্যপদ। خروج মূলধাতু হতে উদ্ভূত ক্রিয়া خَرَجَ -এর অর্থ 'বের হওয়া।' তাই উৎপন্ন ফসলকে খারাজ বলে, যেহেতু তা জমি হতে বের হয়। মূলধাতুর অর্থের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় সরকারি রাজস্বব্যবস্থায় নানাবিধ 'কর' বোঝাতে খারাজ শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, জিযইয়া করকে (যা মাথাপিছু আরোপ করা হয়) خراج الرأس বলা হয়। আর ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের ওপর আরোপিত করকে خراج الأرض বলা হয়। কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনোকিছু বের করে প্রদান করার দ্যোতনা বিদ্যমান। আল-বারাকাতী খারাজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

ما حصل من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام ونحوها ثم سمي ما يأخذه السلطان، فيطلق على الضريبة والجزية ومال الفيء، وفي الغالب يختص بضريبة الأرض.

জমির ফসল, ভাড়া বা দাসের পারিশ্রমিক ও অনুরূপ হতে যা অর্জিত হয় তাই খারাজ। তারপর সুলতান বা শাসক জনগণ হতে যা গ্রহণ করে তার নাম দেয়া হয় খারাজ; ফলে কর, জিযইয়া ও ফাই-এর সম্পদের ওপর শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দটি ভূমিকর-এর সঙ্গে নির্দিষ্ট (Al-Barakatī 2003, 86)।

আল-বারাকাতী-এর সংজ্ঞার শেষ বাক্যটি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আলোচনায়ও জমির উৎপাদিত ফসলের ওপর সরকার নির্ধারিত কর বোঝাতে খারাজ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। খারাজের অন্যান্য অর্থ এখানে বিবেচ্য নয়।

খারাজের বিধান চালুর ইতিহাস

খারাজ প্রবর্তনের সঙ্গে দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব রা.-এর নাম জড়িত হয়ে আছে। তাঁর আমলে ইরাক, শাম ও মিশর পদানত হলে বিজিত ভূমির ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বিশেষত ইরাকের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জয়ের পর প্রশ্নটি জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়। নিয়মানুযায়ী গনিমতের সম্পদ বিজয়ী যোদ্ধা ও অন্যান্য হকদারের মাঝে বণ্টন করা হয়। প্রথমদিকে 'উমার রা. ইরাকের বিজিত ভূমি বণ্টনের চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু আলী রা. ও মু'আয ইবনে জাবাল রা.-এর পরামর্শে এ চিন্তা থেকে সরে আসেন। সাহাবীগণের একাংশ, যেমন বিলাল ইবনে রাবাহ ও যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম রা. বিজিত ভূমি বণ্টন করার পক্ষে ছিলেন। ফলে 'উমার রা. বিস্তৃত পরিসরে পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আওস ও খাযরাজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করেন। সবাই তাঁর অভিমত সমর্থন করলে তিনি ইরাকের ভূমি বিজয়ী যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন না করে তাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের বহাল রেখে ব্যক্তিদের ওপর জিযইয়া ও ভূমির উৎপাদিত ফসলের ওপর খারাজ আরোপ করেন। বিজিত ভূমি বণ্টন না করে খারাজ আরোপ করে সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের বহাল রাখার পক্ষে যুক্তি দিয়ে 'উমার রা. বলেছিলেন,

قد سمعتمْ هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم، ولكني رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى. وقد غنّمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم فقسمتُ ما غنموا من أموال بين أهله، وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وقد رأيتُ أن أحبس الأرضين بعلوجها واضعا عليهم فيها الخراج، وفي رقابهم الجزية، يؤدونها فتكون فيئا للمسلمين المقاتلة والذرية ولمنْ يأتي بعدهم. أرأيتهم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرض والعلوج؟ فقالوا جميعا: الرأي رأيك، فنِعم ما قلتَ. إذا لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوّون به، رجع أهل الكفر إلى مدنهم.

আপনারা তো এঁদের কথা শুনলেন যারা মনে করছে যে, আমি তাদের অধিকার হরণ করেছি। কিন্তু আমি তো মনে করছি, কিসরার রাজ্যের পর জয়ের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ আমাদেরকে গনিমত হিসেবে তাদের সম্পদ, ভূমি ও মানবসম্পদ দিয়েছেন। গনিমতের (অস্থাবর) সম্পদ হকদারের মাঝে আমি বণ্টন করে দিয়েছি, আর খুমুস বা এক পঞ্চমাংশও যথাবিহিত স্থানে প্রেরণ করেছি। আমি বিজিত ভূমিতে বাসিন্দাদেরকে বহাল রাখতে চাই, ব্যক্তিদের ওপর জিযইয়া ও (উৎপাদিত ফসলের) ওপর খারাজ আরোপ করে, যা তারা বছরের পর বছর আদায় করতে থাকবে, ফলে তা মুসলিম যোদ্ধা, তাদের পরিবার পরিজন ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ফায় হিসেবে থাকবে। তোমরা কি মনে করো, সীমান্তে পাহারা দেয়ার জন্য লোক লাগবে? বড় বড় শহরগুলোর জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখতে হবে? তাদেরকে ভাতা দিতে হবে? কীভাবে তা দেয়া যাবে যদি ভূমি ও তার বাসিন্দাকে বিজয়ীদের মাঝে বণ্টন করা হয়? একথা শুনে সবাই বলল, আপনার অভিমতই সঠিক। যদি লোক পাঠিয়ে সীমান্ত ও শহরগুলো পাহারা দেয়া না হয় এবং তাদেরকে শক্তিশালী করা না হয় তাহলে কাফিররা তাদের শহরে (যা মুসলিমরা জয় করেছে) ফিরে আসবে (Abū Yūsuf 1979, 25)।

পরামর্শের সময় একাধিক মত পাওয়া গেলেও পরে সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যে 'উমার রা. ইরাকের বিজিত ভূমিতে খারাজ আরোপ করেন। এভাবেই ইসলামের ভূমি ব্যবস্থাপনায় খারাজ চালু হয়। প্রজ্ঞাবান খলিফা 'উমার রা. উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, খিলাফতের সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় খরচ মেটানোর জন্য আয়ের স্থায়ী উৎস থাকা উচিত। কারণ যাকাত ও 'উশর নির্দিষ্ট খাতের বাইরে ব্যয় করা যায় না। তাছাড়া গনিমত লাভের বিষয়টি নিশ্চিত নয়, যে-কোনো সময় বিজয়াভিযান বন্ধ বা সঙ্কুচিত হয়ে যেতে পারে। গনিমতের সম্পদের ব্যয়খাতও নির্দিষ্ট। অতএব, বর্ধিষ্ণু খিলাফতের খরচ মেটানোর জন্য আয়ের ভিন্ন উৎস আবিষ্কার করা দরকার। বিজিত ভূমি যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করা হলে গুটিকয়েক ব্যক্তি লাভবান হবে। পক্ষান্তরে তা রাষ্ট্রের মালিকানাধীনে রেখে বিজিত জনগোষ্ঠীকে বহাল করে তাদের উৎপাদনের ওপর খারাজ আরোপ করা হলে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি পাবে। একইভাবে তা হতে পরবর্তী প্রজন্মও উপকৃত হতে পারবে। এভাবে ইরাকের বিজিত ভূমিকে সকল মুসলিমের মালিকানাভুক্ত করে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় রেখে খারাজ আরোপের মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। পরবর্তীকালে শাম ও মিশরে একই ব্যবস্থা নেয়া হয়।

খারাজের প্রকারভেদ ও পরিমাণ

খারাজ দুই প্রকার:

১. খারাজ আল-ওয়াযীফাহ (خراج الوظيفة) বা নির্ধারিত খারাজ;

২. খারাজ আল-মুকাসামাহ (خراج المقاسمة) বা ভাগবর্গাভিত্তিক খারাজ।

এই দুই প্রকারের খারাজের পরিচয় ও পরিমাণের আলোচনা কিছুটা ইতিহাসনির্ভর।

১. খারাজ আল-ওয়াযীফাহ (خراج الوظيفة) বা নির্ধারিত খারাজ

আল-বারাকাতী বলেন,

> هي الوظيفة المعينة التي توضع على أرض كما وضع عمر ﷺ على سواد العراق.
>
> কোনো ভূমিতে নির্দিষ্ট যে কর আরোপ করা হয় তাকে **খারাজ আল-ওয়াযীফাহ** বলা হয়। যেমন 'উমার (রা.) ইরাকের সাওয়াদ[৩] ভূমিতে আরোপ করেছিলেন (Al-Barakatī 2003, 86)।

খারাজ আল-ওয়াযীফাহ (خراج الوظيفة) বা নির্ধারিত খারাজ-এর পরিমাণ

খারাজ আল-ওয়াযীফাহ বা নির্ধারিত খারাজের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে হলে ইরাকের ভূমিতে 'উমার রা.-এর খারাজ আরোপের পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। ইরাকের বিজিত ভূমিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের বহাল রেখে তাদের জমিতে খারাজ আরোপের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর খলীফা উমার রা. জমির প্রকৃতি ও পরিমাপের আলোকে খারাজ নির্ধারণের দায়িত্ব দিয়ে 'উসমান ইবনে হুনায়ফ রা.-কে এবং তাঁকে তত্ত্বাবধান করার জন্য হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা.-কে প্রেরণ করেন।

'উসমান ইবনে হুনায়ফ জরিপ করে ইরাকের সাওয়াদ ভূমির পরিমাপ নির্ধারণ করেন ৩,৬০,০০,০০০ (তিন কোটি ষাট লাখ) জারিব[৪] (Abū 'Ubaid 1989, 148)। তারপর অনুপুঙ্খ বিবেচনার পর নিম্নরূপ খারাজ ধার্য করেন:

ক. جريب الزرع: সেচসুবিধার আওতাভুক্ত সকল জমিতে প্রতি জারিবে এক কাফিয[৫] ও এক দিরহাম[৬];

খ. جريب الرطبة বা শসা, তরমুজ, বেগুন ও অনুরূপ ফসলের ক্ষেত্রে প্রতি জারিবে পাঁচ দিরহাম;

গ. جريب الكرم নিরবচ্ছিন্ন আঙ্গুর ও খেজুর বাগানের ক্ষেত্রে প্রতি জারিবে দশ দিরহাম আদায় করবে (Al-Marghīnānī 1417 H. 4: 307; Al-'Ainī 1999, 7: 227; Qil'ajī 1981, 297-98)।[৭]

---

৩. سواد العراق : ইরাকের বাসরা ও কুফা শহরের মধ্যবর্তী ও চতুর্পার্শ্বের গ্রামীণ এলাকা। এটির দৈর্ঘ্য: ইরাকের মুসেল শহরের সীমানা হতে আব্বাদানের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত, প্রস্থ: হুলওয়ানের পাহাড় দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভূমি হতে কাদিসিয়্যার প্রান্ত পর্যন্ত, যা আরব ভূমির উযায়ব-এর সাথে মিলেছে (Abū 'Ubaid 1989, 151)।

৪. জারিব = ৩৬০০ বর্গগজ (Al-'Ainī 1999, 7: 226)।

৫. কাফিয: কাফিযের পরিমাণ নির্ধারণে মতভেদ আছে। কেউ বলেন এটি হাজ্জাজী কাফিয, যার পরিমাণ হল আট রতল বা এক সা'। আবার হেদায়াকার লিখেছেন, এটি হাশিমী কাফিয, যার পরিমাণ ৩২ রতল। শাফিঈ মাযহাব মতে ১২ সা' বা প্রায় ২৫ কেজি।

৬. আতরাযি বলেন, 'যে জমিতে যে ফসল উৎপাদিত হয় সেটির এক কাফিয।' ইমাম জহিরুদ্দিন বলেন, যা-ই উৎপাদন করুক না কেন এক কাফিয গম বা যব আদায় করতে হবে (Al-'Ainī 1999, 7: 227)।

৭. ইরাকের ভূমিতে আরোপিত খারাজের পরিমাণ সম্পর্কে ভিন্ন তথ্যসম্বলিত আরো কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় : যেমন আবু মিজলায হতে বর্ণিত, 'উমার রা ইরাকের ভূমি পরিমাপের জন্য 'উসমান ইবনে হুনায়ফকে প্রেরণ করেন। তিনি প্রতি জারিব আঙ্গুরের খেতে দশ দিরহাম, প্রতি

'উমার ইবনুল খাত্তাব রা. খারাজ আরোপের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সাবধান করতেন। তাঁর দুই প্রতিনিধি খারাজ নির্ধারণের পর মদীনায় ফিরে গেলে 'উমার রা. তাদেরকে বলেন, 'তোমরা কী করেছো, ভেবে দেখো। তোমরা ভূমির ওপর উৎপাদন ক্ষমতার বেশি (খারাজ) আরোপ করোনি তো?' হুযায়ফা রা. বলেন, 'আমরা জমির ওপর যা আরোপ করেছি তা সাধ্যের মধ্যে। ফসল হতে যতটুকু গ্রহণ করেছি, ততটুকু তাদের জন্য অবশিষ্ট রেখেছি।' 'উসমান ইবনে হুনায়ফ বলেন, 'আমরা জমির ওপর যা আরোপ করেছি তা সাধ্যের মধ্যে। বরং তাদের জন্য একটু বেশিই অবশিষ্ট রেখেছি।' উমার রা. আবারো বললেন, 'তোমরা কী করেছো, ভেবে দেখো। তোমরা ভূমির ওপর উৎপাদন ক্ষমতার বেশি (খারাজ) আরোপ করোনি তো? আল্লাহ যদি আমাকে নিরাপদে রাখেন তবে আমি ইরাকের বিধবা নারীদেরকে এমন অবস্থায় রাখব যে, আমার পরে তারা কারো প্রতি মুখাপেক্ষী হবে না (Qil'ajī 1981, 297)।'

সাওয়াদুল ইরাকে আরোপিত খারাজের পরিমাণকে মান হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু উপর্যুক্ত ফসলগুলো ব্যতীত আরো বহু ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়। তাছাড়া আরব ভূখণ্ডের সর্বত্র জারিব-এর পরিমাণ সমান নয়। বহু অনারব দেশে জারিব পদ্ধতিতে জমি পরিমাপ করা হয় না। সেক্ষেত্রে খারাজের পরিমাণ নির্ধারণে দু'টো বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে: (১) সাওয়াদুল ইরাকের জারিবের সঙ্গে স্থানীয় পরিমাপের প্রতি তুলনা সাপেক্ষে জমির একক নির্ধারণ, (২) জমির উর্বরতা, উৎপাদন ক্ষমতা ও কৃষকের সামর্থ্য বিবেচনায় নেয়া। তবে ফকীহগণের মতে আরোপিত খারাজের পরিমাণ কোনোভাবেই উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকের বেশি হতে পারবে না (Al-Marghīnānī 1417 H., 4: 308)।

খারাজ আল-ওয়াযীফাহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ, মাটির উর্বরতা, পানির প্রাপ্যতা ও কৃষকের সামর্থ্যসহ উৎপাদন সংক্রান্ত অন্যান্য সূচকগুলো বিবেচ্য, উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণ নয়। তাই চাষ না করে জমি ফেলে রাখলেও খারাজ দিতে হয়। এটি অনেকটা উজরা-এর মত। ফসল উৎপাদন কম হোক বা বেশি হোক, নির্দিষ্ট পরিমাণ খারাজ দিতে হবে। তবে উৎপাদন খুব কম হলে খারাজের পরিমাণ কমানো জায়েজ। আর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে, ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে, প্রথমবার আরোপিত খারাজের চেয়ে বেশি খারাজ আরোপ করা বৈধ নয়। খারাজ আল-ওয়াযীফাহ-এর ক্ষেত্রে সহজতার একটি দিক হল, একাধিকবার চাষাবাদ করলেও এটি বছরে একবারই আদায় করতে হয়।

জারিব খেজুরে আট দিরহাম, প্রতি জারিব রুতবাহ-এ ছয় দিরহাম, প্রতি জারিব গমের ক্ষেত্রে চার দিরহাম ও প্রতি জারিব যবের ক্ষেত্রে দুই দিরহাম খারাজ আরোপ করেন (Ibn al-Humām 2003, 6: 34; Abū 'Ubaid 1989, 147-48)। উল্লেখ্য যে, একই প্রকারের ফসলে খারাজের পরিমাণ সম্পর্কে ভিন্নধর্মী বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন উপরের বিবরণে দেখা যাচ্ছে। এর কারণ হল সাওয়াদের সকল জমি উৎপাদন ক্ষমতার বিচারে সমমানের বা সমশ্রেণির ছিল না। তাই ফসল অভিন্ন হলেও জমিভেদে খারাজের পরিমাণ ছিল বিভিন্ন।

তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে খারাজ মওকুফ করা হয়। যেমন অতিবৃষ্টি বা বন্যার কারণে ফসল বিনষ্ট হলে, বা খরার কারণে উৎপাদন না হলে, কিংবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল বিনষ্ট হলে দুর্যোগ বছরের খারাজ মওকুফ করতে হবে (Al-Marghīnānī 1417 H. 4: 309)।

'উমার রা. ইরাকের ভূমিতে খারাজ আরোপের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সমকালীন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ সংরক্ষণের যে ধারা শুরু হয় পরবর্তীকালে তা অব্যাহত থাকে। তাঁর আমলেই শাম ও মিশরের ভূমিতে খারাজ আরোপ করা হয়। পরবর্তী খলিফাদের আমলেও যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত ভূমিতে এই পদ্ধতিতে খারাজ আরোপ অব্যাহত থাকে।

২. খারাজ আল-মুকাসামাহ (خراج المقاسمة) বা ভাগবর্গাভিত্তিক খারাজ

খারাজ আল-মুকাসামাহ পরিচয় দিতে গিয়ে আল-বারাকাতী বলেন,

> هو جزء معين من الخارج يضع الإمام عليه كما يضع الربع أو الثلث ونحوهما أو نصف الخارج غاية الطاقة.
>
> 'ইমাম বা শাসক উৎপাদিত ফসলের যে নির্দিষ্ট অংশ খারাজ হিসেবে আরোপ করেন, তাকে খারাজ আল-মুকাসামাহ বলা হয়। যেমন উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা সর্বোচ্চ দুই ভাগের এক ভাগ বা অর্ধেক খারাজ ধার্য করা (Al-Barakatī 2003, 86)।'

খারাজ আল-মুকাসামাহ প্রবর্তনের ইতিহাস ও পরিমাণ

খারাজ আল-ওয়াযীফাহ যেমন সময়ের প্রয়োজনে প্রবর্তিত হয়েছিল, তেমনি চালু হয় খারাজ আল-মুকাসামাহ। সাওয়াদুল ইরাকে 'উমার রা. কর্তৃক আরোপিত নির্ধারিত খারাজ প্রায় দেড় শত বছর চালু ছিল। তারপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আবেদনের প্রেক্ষিতে 'আব্বাসী খলীফা আল-মাহদী নির্ধারিত খারাজের (خراج الوظيفة) পরিবর্তে ভাগবর্গাভিত্তিক খারাজ (خراج المقاسمة) চালু করেন। এ প্রসঙ্গে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। ইয়াহইয়া ইবনে আদম উল্লেখ করেছেন যে, সাওয়াদুল ইরাকের অধিবাসীরা খারাজ আল-ওয়াযীফাহ-এর ব্যাপারে 'আব্বাসী খলীফা আল-মানসুর (১৫৮ হি.)-এর কাছে আপত্তি করেছিল। তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে মারা যান। তারপর খলীফা আল-মাহদী সাওয়াদ ভূমিতে নির্ধারিত খারাজের পরিবর্তে ভাগবর্গাভিত্তিক খারাজ আরোপ করেন। তবে উকবাহ হুলওয়ান অঞ্চলে আগের ব্যবস্থা চালু ছিল (Al-Balazurī, 280)।

আল-মাওয়ার্দি ও আবু ইয়া'লা আল-ফার্‌রাহ, খারাজ আল-মুকাসামাহ প্রবর্তনের আরেকটি কারণ উল্লেখ করেছেন: 'আব্বাসী খলীফা আল-মানসুরের শাসনামলে খাদ্যশস্যের দাম কমে যায়, উৎপাদিত ফসলের মূল্যে খারাজ আদায় করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, সাওয়াদের ভূমি পরিত্যক্ত হওয়ার উপক্রম হয়। তখন 'আব্বাসী খলীফা আল-মানসুর নির্ধারিত খারাজের পরিবর্তে বর্গাভিত্তিক খারাজ চালু করেন (Al-Māwardī, 176)।[৮]

৮. খারাজ আল-মুকাসামাহ প্রবর্তনের সূচনা সম্পর্কে ভিন্নমত পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই সর্বপ্রথম খারাজ আল-মুকাসামাহ বা ভাগভিত্তিক খারাজ প্রবর্তন করেছিলেন।

খারাজ আল-ওয়াযীফাহ ও খারাজ আল-মুকাসামাহ-এর পার্থক্যগুলো নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হল:

পার্থক্যের ক্ষেত্র	খারাজ আল-ওয়াযীফাহ	খারাজ আল-মুকাসামাহ
খারাজের পরিমাণ	খারাজের পরিমাণ পূর্বনির্ধারিত, যেমন এক জারিব ভূমিতে দশ কাফীয শস্য	অংশ নির্ধারিত, যেমন উৎপাদনের ⅓ বা ¼ বা সর্বোচ্চ ½
বারংবারতা	বছরে একাধিকবার চাষাবাদ করলেও খারাজ একবার আদায় করতে হয়	যত বার শস্য উৎপাদিত হবে ততবার খারাজ দিতে হবে
উৎপাদন ক্ষমতা বনাম প্রকৃত উৎপাদন	উৎপাদনক্ষমতার বিবেচনায় খারাজ আরোপ করা হয়, প্রকৃত উৎপাদন বিবেচ্য নয়	প্রকৃত উৎপাদনের ওপর খারাজ আরোপ করা হয়।
কৃষকের অবহেলা	জমিমালিক উৎপাদন না করে জমি ফেলে রাখলেও নির্ধারিত খারাজ আদায় করতে হবে।	চাষাবাদ না করলে খারাজ আদায় করতে হবে না।

প্রথমদিকে নির্ধারিত খারাজ ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারের খারাজ চালু ছিল না। কিন্তু হিজরী দ্বিতীয় শতকে মাঝামাঝিতে ভাগবর্গাভিত্তিক খারাজ চালু হওয়ার পর প্রায় সকল বিজিত ভূখণ্ডে এই দ্বিতীয় প্রকারের খারাজ চালু হয়। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন চালু হলে প্রথমে খারাজ আল-ওয়াযীফাহ চালু হয়েছিল বলে জানা যায়। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজির সময় খারাজ আল-মুকাসামাহ চালু হয়। বাংলার ভূমিব্যবস্থার বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। মুসলিমরা বাংলা বিজয় করার পর এতদঞ্চলে প্রথমে খারাজ আল-ওয়াযীফাহ চালু ছিল। পরে খারাজ আল-মুকাসামাহ প্রবর্তন করে। ব্রিটিশরা যখন বাংলার দেওয়ানি লাভ করে তখন এতদঞ্চলে খারাজ আল-মুকাসামাহ চালু ছিল।

খারাজী জমির পরিচয়

খারাজী জমির পরিচয় নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

১. যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে তাদের ভূমিতে বহাল রাখা হলে ব্যক্তিদের ওপর জিযইয়া ও ভূমির ওপর খারাজ আরোপ করা হয়। এই প্রকারের জমি খারাজী। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম খারাজ আরোপ করা হয় সাওয়াদুল ইরাকের ভূমিতে। সাওয়াদের সীমানা হল, প্রস্থে আল-উযায়ব হতে উকবাহ হুলওয়ান পর্যন্ত এবং দৈর্ঘ্যে আল-'আলস বা আল-সা'লাবিয়্যাহ হতে

৬ষ্ঠ হিজরীতে খায়বার বিজয়ের পর তিনি সেখানকার ইহুদি বাসিন্দাদেরকে তাদের জমির উৎপাদনের অর্ধেক আদায় করার শর্তে তাদের ভূমিতে বহাল রাখেন। এটিই খারাজ আল-মুকাসামাহ। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এই অভিমত পোষণ করতেন। প্রখ্যাত হানাফি ফকীহ শাসমুদ্দিন আল-সারাখসি জোরালো যুক্তির মাধ্যমে এই অভিমত সমর্থন করেছেন। (দেখুন : Al-Sarakhsī ND., 23/2-3; Al-Zuhailī 1985, 2/823)

'আব্বাদান পর্যন্ত। সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে 'উমার রা. এ বিধান চালু করেছিলেন; তাই বলা যায়, বিজিত ভূমিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের বহাল রেখে খারাজ আরোপ করার বৈধতার ব্যাপারে তাঁদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে 'উমার রা.-এর শাসনামলেই মিশর ও শাম বিজিত হলে ওই দুই অঞ্চলেও খারাজ আরোপ করা হয়। অবশ্য মক্কা এই বিধানের ব্যতিক্রম; পবিত্র শহরটি শক্তি প্রয়োগে জয় করার পর স্থানীয়দের বহাল রাখা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ খারাজ আরোপ করেননি (Al-Marghīnānī 1417 H. 4: 303-04; Al-'Ainī 1999, 7: 220-21)।

২. সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে বিজিত এলাকায় স্থানীয়দের বহাল রাখা হলে তা খারাজী ভূমি বলে বিবেচিত হবে (Al-Marghīnānī 1417 H. 4: 303-04)। কারণ প্রথমবার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা চালুর সময় এই জমি অমুসলিমের ব্যবস্থাপনায় ছিল। অমুলিমদের ওপর উশর আরোপ করা যায় না; আবার ভূমির ওপর খারাজ বা উশরের যে-কোনো এক প্রকার বিধান আরোপ করতেই হয়। তাই এক্ষেত্রে খারাজ আরোপ করা হবে।

৩. মুসলিমরা কোনো ভূমির জনগোষ্ঠীকে বিতাড়িত করে তদস্থলে যদি কোনো অমুসলিম গোষ্ঠীকে বসবাস করানো হয়, তাহলে তাও খারাজী ভূমি বলে গণ্য হবে।

৪. কোনো মুসলিম তার শাসকের অনুমতি নিয়ে অনাবাদি জমি আবাদ করলে ইমাম আবু ইউসুফের মতে আবাদকৃত জমি খারাজী জমির কাছে হলে তা খারাজী বলে গণ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদের মতে খারাজী পানি দ্বারা সেচ দেয়া হলে খারাজী জমি বলে গণ্য হবে।

৫. কোনো অমুসলিম, শাসকের অনুমতি নিয়ে পতিত জমি আবাদ করলে তা খারাজী জমি বলে গণ্য হবে। যেহেতু উশর এক প্রকারের ইবাদাহ, যা পালনে অমুসলিম আদিষ্ট নয়।

৬. মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোনো অমুসলিমকে শাসক যে জমি দান করেন তাও খারাজী জমি (Al-Kasānī 2003, 2: 505)।

৭. কোনো মুসলিম যদি তার ভিটেবাড়ির কোনো অংশকে বাগিচায় পরিণত করেন এবং তা খারাজী পানি দ্বারা সেচ দেয়া হয়, তাহলে তা খারাজী জমি বলে গণ্য হবে (Al-Kasānī 2003, 2: 503)।

৮. অমুসলিম যদি তার ভিটেবাড়ির কোনো অংশকে বাগিচা বা কারম-এ পরিণত করে, তাহলে সেটিও খারাজী ভূমি বলে গণ্য হবে (Al-Kasānī 2003, 2: 505)।

উপর্যুক্ত বিবরণের আলোকে বলা যায়, 'উশরী ও খারাজী জমি নির্ধারণের মূলনীতি তিনটি:

(ক) জমির 'উশরী বা খারাজী হওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হয় ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মুসলিমদের প্রথমবার সম্পৃক্ত হওয়ার সময়।

(খ) মুসলিম দেশের কোনো কৃষিজমি 'উশর বা খারাজের—যে-কোনো একটির বিধানের আওতায় থাকবে।

(গ) 'উশর ফল-ফসলের যাকাত, তাই এতে 'ইবাদাহ-এর অর্থ পাওয়া যায়, অতএব অমুসলিমের ওপর 'উশর আরোপ করা যায় না। তাই সাধারণ বিধান হল এই যে, ভূমিব্যবস্থাপনায় মুসলিমরা প্রথমবার সম্পৃক্ত হওয়ার সময় জমি যদি মুসলিমের ব্যবস্থাপনায় থাকে তাহলে 'উশর আরোপ করা হয়, আর অমুসলিমের ব্যবস্থাপনায় থাকলে খারাজ আরোপ করা হয়।

খারাজী জমির বিধান

খারাজের পরিমাণ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের শিরোনামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খারাজী জমির আরো কিছু বিধান এখানে আলোচনা করা হল:

ওপরের আলোচনা হতে জানা গেল, কোনো ভূমি ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় প্রথমবার আসার সময় যদি অমুসলিমদেরকে ওই ভূমিতে বহাল রাখা হয় তাহলে তার ওপর খারাজ আরোপ করা হয়। অমুসলিমরা 'ইবাদাহ পালনে আদিষ্ট নয় বিধায় খারাজী ভূমিতে 'উশর আরোপ করা হয় না।

তবে নানা কারণে খারাজী ভূমির মালিকানা পরিবর্তন হয়ে মুসলিমদের মালিকানায় আসতে পারে। আবার অমুসলিমরাও 'উশরী ভূমির মালিক হতে পারে। তখন কি বিধান হবে?

১. খারাজী ভূমির অমুসলিম মালিক ইসলাম গ্রহণ করলে ইতঃপূর্বে প্রবর্তিত খারাজের বিধান অব্যাহত থাকবে। তবে জিযইয়া কর বা টোল ট্যাক্স বাতিল হয়ে যাবে (Al-Marghīnānī 1417 H. 4: 311; Ibn al-Humām 2003, 6: 37)। ইরাকের নওশেরা নদী অঞ্চলের জনৈক নেতৃস্থানীয় মহিলার ইসলাম গ্রহণের খবর 'উমার রা.-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন, যদি সে তার জমি নিজের কাছে রাখতে চায় এবং খারাজ আদায় করতে সম্মত হয় তাহলে তার জমি তাকে দিয়ে দাও (Al-'Ainī 1999, 7: 235; Ibn al-Humām 2003, 6: 37)।

২. মুসলিমের জন্য খারাজী জমি ক্রয় করা বৈধ, তবে ইতঃপূর্বে প্রবর্তিত খারাজের বিধান অব্যাহত থাকবে, অর্থাৎ তাকে খারাজ আদায় করে যেতে হবে। বিশিষ্ট সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ, আল-হাসান ইবনে 'আলী ও শুরাইহ রা.-এর সাওয়াদুল ইরাকে জমি ছিল, তাঁরা খারাজ আদায় করতেন (Al-'Ainī 1999, 7: 234-35; Al-Sarakhsī ND., 3: 5; 10: 83)।

৩. মুসলিমের কাছ থেকে কোনো অমুসলিম জমি কিনলে ইমাম আবু হানিফার মতে সে ওই জমির খারাজ আদায় করবে। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, দুইটি 'উশর আদায় করবে অর্থাৎ সে ২০% খারাজ আদায় করবে। ইমাম মুহাম্মাদের মতে, একটি উশরই আদায় করবে (Al-Sarakhsī ND., 3: 6)।

৫. ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'উশরী জমিতে খারাজ আরোপ করা জায়েজ নেই। কোনো সরকার যদি উশরী জমিতে খারাজ আরোপ করে তাহলে শাসকরা গোনাহগার হবে। আরো উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিম যদি কোনো খারাজী জমি কেনে, তবে সে ওই জমির খারাজ আদায় করবে। প্রশ্ন হল, এমন জমিতে তাকে 'উশর আদায় করতে হবে কী না?

এই মাসআলায় মাযহাবগুলোর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাব মতে উশর ও খারাজ একত্র হয়, অর্থাৎ মুসলিম যদি খারাজী জমির মালিক হয় তবে প্রথমে খারাজ আদায় করবে, তারপর অবশিষ্ট উৎপাদনের 'উশর আদায় করবে। হানাফী মাযহাব মতে, 'উশর ও খারাজ একত্র হয় না; তাই খারাজী জমির ওপর 'উশর আরোপ করা যাবে না। অতএব কোনো মুসলিম খারাজী জমির মালিক হলে সে শুধু খারাজ আদায় করবে, তাকে 'উশর দিতে হবে না। বিস্তারিত আলোচনার জন্য ফিকহের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য (Al-Marghīnānī 1417 H. 4: 311; Al-Ainī 1999, 7: 235; Ibnul Humām 2003, 6: 38)।

'উশর ও খারাজের মৌলিক বিধানগুলো উপস্থাপনের পর আমরা প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ তথা বাংলাদেশের ভূমির প্রকৃতি নির্ণয়ে সচেষ্ট।

বাংলাদেশের ভূমি 'উশরী না খারাজী : ভূমি ব্যবস্থা ক্রমবিকাশের আলোকে পর্যালোচনা

পূর্বোক্ত আলোচনা হতে জানা গেছে যে, কোনো অঞ্চল 'উশরী না খারাজী, তা নির্ণয়ে ওই ভূখণ্ডের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মুসলমানদের প্রথমবার সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি জড়িত। অতএব, বাংলাদেশের ভূমির প্রকৃতি নির্ণয় করতে হলে এই ভূখণ্ডে প্রথমবারের মত মুসলিমদের বসতি স্থাপন ও বিজয়ের ইতিহাস আলোচনা করতে হবে। এখানে অতি সংক্ষেপে বাংলাদেশ মুসলিমদের বসতি স্থাপন ও বিজয়ের বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে।

১. বাংলার সঙ্গে আরবদের প্রাচীন যোগাযোগ

মরুর দেশ আরবের লোকেরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য বহির্বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। দক্ষিণ আরব তথা ইয়ামেনের বাসিন্দাদের সমুদ্রবাণিজ্যের বিষয়টি আমাদের সাধারণ জ্ঞানের অংশ। এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব বণিকরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারত ও বাংলার উপকূলীয় এলাকায় আসা-যাওয়া করত। কিন্তু ওই সময় লেখালেখির চল না থাকায় সেই সুদূরের যোগাযোগের কোনো লিখিত বিবরণ আমরা পাই না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পর ভারত ও বাংলা-উপকূলে আরবদের আনাগোনা বেড়ে যায়। ৮ম শতকের প্রারম্ভে আরবরা সিন্ধু জয় করে। তারপর পূর্বমুখী বিজয়াভিযান থেমে গেলেও বাণিজ্য যোগাযোগ বেড়ে যায়, সঙ্গে যোগ হয় দীন প্রচারের উদ্দেশ্য। বাংলায় কয়েকজন সাহাবীর আগমনের তথ্যও পাওয়া যায়, যদিও এমন দাবির সমর্থনে কোনো পাথুরে প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৯] তবে নবম শতক হতে আরব বণিক, পরিব্রাজকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও ভূগোলবিদের রচনায় বাংলা-উপকূলে আরব বণিকদের আনাগোনার বিবরণ উঠে আসে। এতদসংক্রান্ত সর্বপ্রাচীন যে

৯. সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে যে, লালমনিরহাটের পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস গ্রামে ৬৯ হিজরীতে নির্মিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এটির প্রাচীনত্ব নির্ধারিত হয়েছে কিনা জানা নেই। যদি কার্বন টেস্ট বা অন্য কোনো পরীক্ষায় মসজিদটির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয় তাহলে বাংলায় সাহাবীগণের আগমন ও মুসলিমদের আদি বসবাসের ইতিহাসচর্চায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট হিসেবে বিবেচিত হবে।

লিখিত বিবরণ আমাদের হাতে পৌঁছেছে সেটি হল নবম শতকের আরব বণিক সুলায়মান আল-তাজির রচিত ভ্রমণবৃত্তান্ত *সিলসিলাহ আল-তাওয়ারিখ*।[১০] তিনি ভারতের অন্তর্গত রুহমি বা রাহমা (رهمى) নামক এক রাজ্যের বিবরণ দিয়েছেন, যেখানে আতরের কাঁচামাল আগর গাছ এবং অতি উন্নতমানের সূক্ষ্ম বস্ত্রও পাওয়া যেত, যা মাঝারি আকারের আংটির ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত। ওই রাজ্যের প্রাণীকুলের মাঝে সুলায়মান বিশেষভাবে হাতি ও গণ্ডারের উল্লেখ করেছেন। এক শিংওয়ালা প্রাণীটির গোশত তিনি খেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। রুহমি রাজ্যের মুদ্রার নাম তিনি 'কড়ি' বলে উল্লেখ করেছেন (Renaudot 1733, 17-18)।

সুলায়মানের পরে আরো কয়েকজন আরব পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদ রুহমি রাজ্যের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁদের বিবরণে আরো কিছু অতিরিক্ত তথ্য উঠে এসেছে। আল-মাস'উদী-এর মতে রুহমি রাজ্যের স্থল ও জলসীমান্ত রয়েছে (Al-Mas'udī 1973, 1: 132-33)। ইবনে খুরবাযবেহ-এর মতে রুহমি-এর সন্নিহিত রাজ্যের নাম কামরূন (Ibn Khurdajbeh 1967, 63-4)।

বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের গবেষকগণ এ বিষয়ে একমত যে, আরব পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদগণের 'রুহমি' ও 'প্রাচীন বাংলা' অভিন্ন রাজ্য। বাংলাদেশে এখনো হাতি পাওয়া যায়। এক সময় এতদঞ্চলে বিপুল সংখ্যায় গণ্ডার পাওয়া যেত। এখনো পার্শ্ববর্তী ভারতীয় রাজ্য আসামে গণ্ডার পাওয়া যায়। সুলায়মান তাজিরের বিবরণে উল্লেখিত উন্নতমানের সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রাক-ব্রিটিশ যুগের মসলিন কাপড় ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বাংলাদেশ ও আসামে এখনও বিপুল পরিমাণ আগর গাছ উৎপাদিত হয়। আর রুহমির মুদ্রার নামও বাংলার সঙ্গে মিলে যায়; প্রাচীন বাংলায় মুদ্রা হিসেবে 'কড়ি' ব্যবহৃত হত। রুহমি রাজ্যের সন্নিহিত কামরূন নামে যে রাজ্যের নাম উল্লেখ করেছেন ইবনে খুরদাযবেহ, ঐতিহাসিকদের মতে সেটি কামরূপ তথা আসাম। এভাবে রুহমি ও প্রাচীন বাংলার অভিন্নতা প্রমাণিত হয়।

রুহমির সঙ্গে বাংলার অভিন্নতা প্রমাণে ইতিহাসবিদ আবদুল করিমের উদ্ঘাটন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, নবম শতকে 'বাংলা' নামটি চালু হয়নি। আরবরা সাধারণত রাজার নামে রাজ্যের নামকরণ করত। অর্থাৎ আরবরা এই অঞ্চলের রাজার নাম রুহমি বলে জানত। আবদুল করিমের মতে, লিপিকারের ভুলে এই শব্দে কিছুটা বিকৃতি ঘটেছে। শব্দটি মূলত ছিল درهمى, শুরুতে 'د' বাদ পড়ায় رهمى হয়ে গেছে। অর্থাৎ সুলায়মান তাজির ধর্মীরাজ বা ধর্মপালের রাজ্যের বিবরণ দিয়েছেন। নবম শতকের প্রারম্ভে পাল বংশের রাজা ধর্মপাল (৭৭০-৮১০) বাংলা শাসন করতেন।

১০. সুলায়মান আল-তাজির ৮৫১ সালে ভারত উপকূলে এসেছিলেন। *সিলসিলায়* তিনি আরব উপকূল হতে চীন পর্যন্ত সমুদ্রপথে আসা-যাওয়ার বিবরণ এবং ভারত ও বাংলা উপকূল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু রাজ্য, পণ্য ও বন্দরের বিবরণ দিয়েছেন। এ প্রবন্ধকারের সংগ্রহে এই মূল্যবান বইয়ের ইংরেজি অনুবাদের একটি কপি আছে, যেটি ১৭৩৩ সালে লন্ডন হতে প্রকাশিত হয়েছিল (Eusebius Renaudot (1733). *Ancient Accounts of India and China by two Mohammedan Travellers*. London: Sam. Harding.)।

এই অঞ্চলের শাসক হিসেবে সুলায়মান হয়ত বিখ্যাত এই রাজার নামই শুনে থাকবেন। তাই তিনি বাংলাকে ধর্মী রাজ্য বলে অভিহিত করেছেন, যা নুসখাকারের (প্রতিলিপিকার) ভুলে রুহমি রাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছে (Karim 2014, 39)।

ইতিহাসবিদ আবদুল করিমের এই বিশ্লেষণের সমর্থনে পাথুরে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তিনি সুলায়মান তাজিরের মূল আরবী বই দেখেননি। ইংরেজি অনুবাদের সহায়তা নিয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধকারের কাছে মূল আরবী বইটি রয়েছে, যেখানে রুহমি রাজ্যের রাজা হিসেবে دهرم (ধর্ম)-এর নাম উল্লেখ রয়েছে (Al-Sirafī 1999, 35-36)। অতএব, মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়, নবম-দশক শতকের আরব পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদগণের বিবরণে উল্লেখিত রুহমি রাজ্য ও প্রাচীন বাংলা অভিন্ন ভূখণ্ড।

নবম-দশক শতকের আরব লেখকদের বিবরণে প্রাচীন বাংলার আরো কিছু স্থানের নাম পাওয়া যায়, যেমন সামন্দর (سمندر), রামী (الرامي) ও রামিনী (الرامني) ইত্যাদি। কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বাদ দিলাম। উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, অন্ততপক্ষে নবম শতকে বাংলার উপকূলীয় এলাকায় আরব বণিকদের যাতায়াত ছিল। অর্থাৎ মুসলিম বিজয়ের কমপক্ষে তিন শত বছর পূর্বে আরবরা বাণিজ্য ব্যাপদেশে সমুদ্রপথে বাংলায় যাতায়াত করতেন।

প্রশ্ন হল, আরবদের যাতায়াত কি কেবল বাণিজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? তারা কি বাংলার কোনো অঞ্চলে, অন্তত উপকূলীয় এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন?

২. মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলার মুসলিম বাসিন্দা

ইতিহাসবিদ ড. মোহর আলী ও ড. আবদুর রহিম কতিপয় পরিস্থিতিগত প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যাতে সীমিত পর্যায়ে হলেও বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে আরব মুসলিমদের বসতি স্থাপনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রথমত : সেকালে যোগাযোগব্যবস্থা বর্তমান সময়ের মত উন্নত ছিল না। বাণিজ্য ব্যাপদেশে সমুদ্রযাত্রা করে বহু বণিক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারতেন না। জাহাজডুবির ঘটনাও কম ঘটত না। তাই এটি ধরে নেয়া যায়, জাহাজডুবির কারণে অনেক আরব বণিক বাংলার উপকূলীয় বন্দরগুলোতে, বিশেষত চট্টগ্রামে অবতরণ ও বসবাসে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করে তারা এখানে স্থায়ী হয়েছেন।

দ্বিতীয়ত : পণ্য সংগ্রহ ও পণ্যের যোগান মসৃণ করার জন্য বণিকগণ সাধারণত বিভিন্ন বন্দরে এজেন্ট নিয়োগ করতেন। চট্টগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল। এই বন্দর দিয়ে বাংলায় হতে বহু পণ্য, বিশেষত আগর গাছ, উন্নত মানের বস্ত্র, হাতির দাঁত ও গণ্ডারের শিং আরবে রপ্তানি করা হত। তাই এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, আরব বণিকরা বাংলার বন্দরগুলোতে স্বদেশী এজেন্ট নিয়োগ করতেন। এভাবে ক্ষুদ্র আকারে হলেও একটি মুসলিম কমিউনিটি গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত : আরব ভূখণ্ডে রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রতিবাদ-বিদ্রোহ ও নির্যাতন এড়াতে অনেক আরব স্বদেশ ছেড়ে দূরবর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নিত। অস্বাভাবিক নয়,

অনুরূপ ঘটনায় বহু নির্যাতিত আরব স্বদেশ ছেড়ে দূরস্থিত অঞ্চলে আশ্রয় নেয়ার প্রক্রিয়ায় চট্টগ্রামসহ বাংলার উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপসমূহে বসতি স্থাপন করেছিলেন (Rahim 1963, 1: 42-3; Ali 1985, A1: 37)।

ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিম ও ড. আবদুর রহিম বিশ্লেষণমূলক অনুমানের সমর্থনে কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায়। রুহমি রাজ্যের (অর্থাৎ প্রাচীন বাংলার) গণ্ডারের বিবরণ দিতে গিয়ে আল-মাস'উদী লিখেছেন,

> والهند تأكل لحمه وكذلك من في بلادهم من المسلمين، لأنه نوع من البقر، .. وهذا النوع من الحيوان وهو النشان يكون في أكثر غابات الهند إلا أنه في مملكة رهمي أكثر.
>
> ভারতীয়রা এটির (গণ্ডারের) গোশত খায়, তেমনিভাবে ওই দেশে বসবাসরত মুসলমানরাও (গণ্ডারের গোশত খায়); যেহেতু এটি গরুর একটি প্রকার... এই জন্তু, অর্থাৎ গণ্ডার ভারতের অধিকাংশ জঙ্গলে পাওয়া যায়, তবে রুহমি রাজ্যে (প্রাচীন বাংলায়) এটির সংখ্যা অধিক (Al-Mas'udī 1973, 1: 133)।

আল-মাস'উদী (৮৯৬-৯৫৬) খ্রিস্টীয় দশম শতকের আরব ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজক। তিনি দীর্ঘদিন মুলতান ও শ্রীলংকায় অবস্থান করেছিলেন। তাই ভারত সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতাজাত বর্ণনা অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ। দশম শতকে তিনি জানাচ্ছেন যে, রুহমি রাজ্যে বসবাসরত মুসলিমরা গণ্ডারের গোশত খেত। অর্থাৎ মুসলিম বিজয়ের প্রায় দুই শত বছর পূর্বে বাংলায় মুসলমানদের বসবাসের তথ্য পাওয়া গেল।

বাংলার সকল অঞ্চল একই সময়ে বিজিত হয়নি। বখতিয়ার খিলজির নদীয়া জয়ের পর পুরো বাংলা মুসলিম শাসনের অধীনে আনতে আরো প্রায় দেড় শত বছর লেগেছিল। ওই সময় দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় অমুসলিম শাসন চালু ছিল। হিন্দুশাসিত বহু এলাকায় মুসলিম বসতি ছিল। একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত হল, হাতিয়া, সন্দ্বীপসহ উপকূলীয় অঞ্চল। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে চট্টগ্রাম মুসলিম শাসনের অধীনে এলেও সন্নিহিত দ্বীপাঞ্চলগুলোতে ষোড়শ শতকের পূর্বে মুসলিম শাসন চালু হয়নি। কিন্তু পর্তুগিজ লেখক বার্থেমা ও বারবোসা মেঘনার মোহনাস্থিত দ্বীপাঞ্চল পরিব্রাজন করার সময় বহু আরব, পারসিক ও আবিসিয়ান-বংশোদ্ভূত মানুষকে সেখানে বসবাসরত দেখেছিলেন (Rahim 1963, 1: 42-3)। এতে প্রমাণিত হয়, বাণিজ্যের সূত্রে আসা যাওয়ার কোনো এক পর্যায়ে দূরদেশী মুসলিমরা বাংলার উপকূলীয় এলাকায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

মুসলিম শাসনের পূর্বেই বাংলায় মুসলিমদের বসবাসের আরো কিছু নমুনা উপস্থাপন করা যায়।

৩. মুসলিম-বিজয়ের পূর্বে বাংলায় ইসলাম প্রচার

উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার ও মুসলিমদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা হয়েছে ধাপে ধাপে, যার সূচনা হয়েছিল ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে। পুরো ভারতবর্ষে মুসলিমদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে প্রায় ষোড়শ শতাব্দী

পর্যন্ত লেগে যায়। প্রতিটি অঞ্চলের একটি সাধারণ বিষয় উল্লেখ করা যায়, তা হল মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ওলামা-মাশায়েখ ও সূফী-সাধকদের ইসলাম প্রচার, ব্যাপারটি সিন্ধুর ক্ষেত্রে যেমন সত্য (Shafī 1995, 176), তেমনি সত্য উত্তর ভারত ও বাংলার ক্ষেত্রে। বিষয়টা যেন এমন যে, মুবাল্লিগগণ দীন প্রচারের মাধ্যমে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেন; তারপর রাজনৈতিক শক্তি বিজয় সম্পন্ন করতেন।

ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর উল্লেখ করেছেন, গজনীর সুলতান মাহমুদ কাশ্মীরে অভিযান পরিচালনার সময় ওই দেশের সীমান্তে উপস্থিত হলে কাশ্মীরের রাজা নিজে এগিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। তিনি ভারতের সীমান্তবর্তী হাওদাব দুর্গে অভিযান চালাতে গিয়ে দেখেন ওই অঞ্চলের রাজা দশ হাজার প্রজাসহ এগিয়ে আসছেন, তাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল কালেমার ধ্বনি। কোনো-না-কোনো মুবাল্লিগের প্রচারের ফলে তারা হয়ত আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যা সুলতান মাহমুদের জানা ছিল না (Shafī 1995, 176)।

অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে। বঙ্গবিজয়ের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সত্য। ত্রয়োদশ শতকের একেবারে শুরুর দিকে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি নদীয়া ও উত্তরবঙ্গ জয় করেন। কিন্তু তার পূর্বেই অর্থাৎ খ্রিস্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতকে সূফী, 'আলিম ও মুবাল্লিগগণ এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। যেমন, বাবা আদম শহীদ বিক্রমপুরে, শাহ সুলতান রুমী ময়মনসিংহে, শাহ সুলতান মাহি সওয়ার বগুড়ায় ও মখদুম শাহ দাওলাহ শহীদ পাবনায় ইসলাম প্রচার করেন (Haq 2011)। তাঁদের প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। বাংলার প্রান্তিক অঞ্চল চট্টগ্রাম ও সিলেটের ব্যাপারেও বিষয়টি সত্য। চতুর্দশ শতকের সূচনায় (১৩০৩) সিলেট মুসলিমদের শাসনাধীনে আসে। কিন্তু তার আগেই সেখানে স্বল্পসংখ্যক হলেও মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। চট্টগ্রামের বিষয় তো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ চট্টগ্রাম জয় করে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন; কিন্তু কয়েক শতক আগেই সেখানে আরব মুসলিমদের যাতায়াত ও বসতি স্থাপন শুরু হয়েছিল। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সন্নিহিত দ্বীপগুলো ষোড়শ শতাব্দীর আগে মুসলিমদের শাসনাধীনে আসেনি; কিন্তু পঞ্চদশ শতকেই সেখানে বিপুল সংখ্যক আরব ও আবিসিয়ান বণিক বসবাস করত বলে পর্তুগীজ লেখকগণ উল্লেখ করেছেন (Ali, 1985, 1A: 4; Qanungo 1988)।

এটি কোনো ইতিহাস-সংক্রান্ত প্রবন্ধ নয়। আমাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্য অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। এই পর্যায়ে প্রথম মুসলিম বিজয়ের সময় বাংলার ভূমি-ব্যবস্থাপনা নিয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনা উপস্থাপন করছি, এতদঞ্চলের ভূমি 'উশরী না খারাজী - তা নির্ধারণের জন্য এই আলোচনা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলিম বিজয়ের পর বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনা

গজনীর শাসক সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি হিসেবে মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজি বাংলায় অভিযান পরিচালনায় করেন। পরবর্তীকালে দিল্লীকেন্দ্রিক মামলুক সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার শাসকরা তাদের প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন

করতেন। ১৩৫২ হতে ১৫৩৮ পর্যন্ত বাংলার সুলতানগণ স্বাধীনভাবে শাসনকাজ পরিচালনা করেন। এই দুই শত বছরের শাসনকাল 'সুলতানি আমল' হিসেবে পরিচিত। তারপর মোগল আমলে আবারো বঙ্গদেশ দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে ইংরেজরা যখন বাংলার ক্ষমতা দখল করে তখনও এই অঞ্চলে আলঙ্কারিক অর্থে মোগল শাসন চালু ছিল। তাই বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় ভূমি ব্যবস্থাপনার অনুসরণ ছিল।

মুসলিম বিজয়ের পর মালিকানার আলোকে বাংলার ভূমির প্রকৃতি ও ব্যবস্থাপনা

ক. স্থানীয় বাসিন্দাদের ভূমি

ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে কখনো বিজিত বাসিন্দাদেরকে নিজস্ব ভূমি হতে বহিষ্কার করে বা তাদের মালিকানা কেড়ে নিয়ে সেই ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মাঝে বণ্টন করা হয়নি; বরং স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে নিজেদের ভূমিতে বহাল রেখে তাদের ওপর খারাজ আরোপ করা হয়। আনুগত্য স্বীকার ও রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত হলে মুসলিম সুলতানগণ হিন্দু সামন্ত রাজাদেরকেও বহাল রেখেছেন। তাছাড়া ভূমি রাজস্ব আদায়ে জমিদার, শিকদার ও আমিলসহ বিভিন্ন পদবিধারী কর্মচারী নিয়োগ করা হত (Hoque 2016, 24)। তাদের কাজ ছিলো সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে নির্ধারিত ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করে সরকারের কোষাগারে জমা দেওয়া। বিনিময়ে তারা রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ পেতেন। মুসলিম আমলে জমিদারগণ কখনো জমির মালিক বলে গণ্য হত না। ইতঃপূর্বে বর্ণিত বিধান মতে ভারতের অমুসলিম অধ্যুষিত বিজিত ভূমি খারাজী জমি বলে পরিগণিত। তাই সুলতানগণ যে ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন সেটি খারাজ বলে গণ্য করা যায়।

ভারতের ভূমিতে প্রথমে খারাজ আল-ওয়াযীফাহ বা নির্ধারিত খারাজই চালু ছিল। কৃষকেরা নগদ অর্থে তা আদায় করত। পরবর্তীকালে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি নির্ধারিত খারাজের পরিবর্তে খারাজ আল-মুকাসামাহ বা বর্গাভিত্তিক খারাজ চালু করেন (Shafī 1995, 74)।

ভূমি রাজস্বব্যবস্থায় ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের অনুসরণ করলেও বাংলার মুসলিম শাসকরা কখনো বিজিত অমুসলিমদের ওপর জিযইয়া কর আরোপ করেননি। উত্তর ভারতের অমুসলিম বাসিন্দাদের ওপর জিযইয়া কর আরোপের কথা জানা যায় (Ali 1985, 1B: 713)। বাংলার শাসকরা কেবল খারাজ আরোপ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। খারাজের প্রকৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও ভারতের ন্যায় প্রথমদিকে বাংলায়ও খারাজ আল-ওয়াযীফাহ আরোপ করা হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে বর্গাভিত্তিক খারাজ বা খারাজ আল-মুকাসামাহ চালু হয়। তবে উৎপন্ন ফসলের কত অংশ খারাজ হিসেবে আদায় করতে হত, তা নিয়ে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ হতে জানা যায়, ভূমিরাজস্ব হিসেবে এক-পঞ্চমাংশ নেয়া হত; অপরদিকে শেরশাহের আমলে উৎপাদনের এক চতুর্থাংশ নেয়া হত। মরক্কোর বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা চতুর্দশ শতকে সোনারগাঁও হতে চীন যাওয়ার পথে মেঘনাতীরের কৃষকদেরকে

উৎপাদনের অর্ধেক রাজস্ব আদায় করতে দেখেছেন। তবে অন্যান্য বিবরণের আলোকে বলা যায়, ভূমি রাজস্ব হিসেবে ⅓ বা ¼ বা ⅕ আদায় করা হত। কখনো খারাজের সর্বোচ্চ পরিমাণ তথা ½ ধার্য করা হয়নি। ইবনে বতুতা মেঘনাতীরের যে জমি দেখতে পেয়েছিলেন, তা হয়ত চর এলাকা হিসেবে সরকারের মালিকানাধীন খাস জমি ছিল এবং কৃষকেরা বর্গাচাষী হিসেবে উৎপাদনের ½ আদায় করত, ভূমিরাজস্ব হিসেবে নয় (Ibn Battuta 1987, 627; Ali 1985, 1B: 713; Hoque 2016, 26-7)।

ইসলামী বিধানের আলোকে বলা যায়, মুসলিম বিজয়ের পর বাংলার যে ভূমিতে স্থানীয় অমুসলিম বাসিন্দাদের বহাল রেখে খারাজ আরোপ করা হয়েছিল, তা খারাজী ভূমি।

খ. মুসলিমদের ভূমি

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলায়, বিশেষত চট্টগ্রাম ও সন্নিহিত উপকূলীয় এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিমের বসবাস ছিল। আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো ভূখণ্ড বিজয়ের সময় ওই অঞ্চলে বসবাসরত মুসলিমদের জমি 'উশরী জমি; আর এমন জমির উৎপাদনের ওপর খারাজ আরোপ করা যায় না। কিন্তু বাংলার মুসলিম শাসকগণ এ ব্যাপারে বাছবিচার করেননি; তারা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের ভূমিতে খারাজ আরোপ করেছেন; অধিবাসীদের ধর্মীয় পরিচয় বিচার না করে তারা এলাকাভিত্তিক খারাজ আরোপ করেছেন। ড. মোহর আলী বলেন,

> When the Muslims conquered the country they left the local population in free enjoyment of their land and property in lieu of their paying Kharaj. There is no indication in the sources of the imposition of the jizya on the conquered population of Bengal, although, significantly enough, it is found in existence in northern India at least in Akbar's reign. One explanation of non-existence of the jizya in Bengal might be that the idea of Kharaj itself had by that time undergone a change. Originally a tax payable by the conquered and non-Muslim population for their land, it came to be regarded subsequently as a substitute of jizya, and still later on, it was realized as a regular land-tax from both Muslim and non-Muslim population. The Muslim rulers in Bengal seem to have understood kharja in this last sense, and realized it from Muslim and non-Muslim inhabitants alike.

মুসলিমরা এই দেশ জয় করে খারাজ আরোপের বিনিময়ে স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে স্বাধীনভাবে নিজেদের ভূমি ও সম্পদ ভোগ করার অধিকার দিয়েছিল। বাংলার বিজিত বাসিন্দাদের ওপর জিযইয়া কর আরোপের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, যদিও উত্তর ভারতে অন্তত আকবরের যুগে জিযইয়ার প্রচলন ছিল। বাংলায় জিযইয়ার প্রচলন না

> থাকার একটি সম্ভাব্য কারণ এই হতে পারে যে, ওই সময়ে খারাজের ধারণায় কিছু পরিবর্তন এসেছিল। আদিতে খারাজ বলতে বোঝাত, বিজিত অমুসলিম বাসিন্দাদেরকে তাদের জমিতে বহাল রাখার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য ভূমিকর। পরবর্তীকালে এটি জিযইয়ার বিকল্প হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, পরে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছ থেকে নিয়মিত ভূমিকর হিসেবে আদায় করা হত। বাংলার মুসলিম শাসকরা হয়ত খারাজের শেষ অর্থটিই বুঝেছিলেন এবং মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল বাসিন্দা হতে খারাজ আদায় করেছেন (Mohar Ali 1985, 1B: 712)।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'উশরী ভূমিতে খারাজ আরোপ করা যায় না। 'উশরী জমির ওপর শাসকরা খারাজ আরোপ করলে সেই জমির প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় না। প্রথম মুসলিম বিজয়ের সময় ইসলামী বিধানের আলোকে যে জমি 'উশরী হিসেবে পরিগণিত হয়, তা 'উশরী হিসেবেই বহাল থাকবে। অতএব মুসলিম বিজয়ের সময় বাংলায় যে অল্প সংখ্যক মুসলিম অধিবাসী ছিল তাদের ভূমি 'উশরী জমি বলে পরিগণিত।

গ. আবাদকৃত পতিত জমি

উপর্যুক্ত দুই প্রকারের জমি ব্যতীত বাংলায় বিপুল পরিমাণ পতিত জমি ছিল। ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার জনসংখ্যা অনেক কম ছিল। বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ভূমি ছিল। আবার নদীবাহিত এলাকা বলে পতিত জমিগুলো উর্বর ও আবাদযোগ্য ছিল। ব্যক্তিমালিকানাবিহীন পতিত জমি সরকারি জমি বলে পরিগণিত। সরকার এই শ্রেণির জমি সময়ে সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ দিত।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারের অনুমতি নিয়ে পতিত জমি আবাদ করলে সেচের পানির প্রকৃতির ওপর জমির শ্রেণি নির্ধারিত হয়। নদীবহুল বাংলায় ব্যক্তিমালিকানাবিহীন প্রাকৃতিক পানি দ্বারা পতিত জমি আবাদ করা হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। তাই এই শ্রেণির ভুমি হতে যেগুলো মুসলমিরা আবাদ করেছে, সেগুলো 'উশরী ভূমি বলে পরিগণিত।

ঘ. লাখেরাজ জমি

লা অর্থ না, খারাজ অর্থ ভূমিরাজস্ব। অর্থাৎ এমন জমি যা দিল্লির বাদশাহ বা বাংলার সুলতান বা সুবাদার অথবা তাদের প্রতিনিধিরা কোনো নাগরিকের অনুকূলে ভূমিরাজস্ব মওকুফ করে বরাদ্দ দিয়েছেন; এই শ্রেণির জমির উৎপাদন বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোগ করতে পারত এবং তাকে কোনো খারাজ বা ভূমিরাজস্ব আদায় করতে হত না। বাংলাদেশের ভূমির প্রকৃতি নির্ণয়ে লাখেরাজ ভূমির বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

মুসলিম আমলে বাংলায় বিপুল পরিমাণ লাখেরাজ বা নিষ্কর জমি ছিল। নিম্নোক্ত শ্রেণির ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে লাখেরাজ জমি বরাদ্দ দেয়া হত:

ক. শাসকদের সহচর সৈনিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ;

খ. সৈয়দ বংশীয় ব্যক্তিবর্গ ও অভিজাত মুসলিম;

গ. বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর আশ্রয়প্রার্থী সদস্যবৃন্দ;

ঘ. আলিম, শায়খ, সুফী ও ধর্মপ্রচারকবৃন্দ;

ঙ. মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।

নিম্নের ছকে বাংলায় প্রচলিত লাখেরাজ ভূমির প্রকার ও উপকারভোগীদের শ্রেণিভিত্তিক বিবরণ দেয়া হল :

লাখেরাজ ভূমির প্রকার	যার অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হত	বরাদ্দের উদ্দেশ্য
জাগির	সৈনিক ও সরকারি কর্মচারী	নগদ বেতনের পরিবর্তে জীবনকাল পর্যন্ত
তঘমা	সৈনিক ও সরকারি কর্মচারী	নগদ বেতনের বিকল্প হিসেবে স্থায়ী বরাদ্দ
আইমা	ধর্মীয় নেতৃত্ব, আধ্যাত্মিক সাধক ও সৈয়দ বংশীয় ব্যক্তিবর্গ	জ্ঞান ও অধ্যাত্মসাধনায় নিমগ্ন থাকায় রোজগারের সুযোগ না থাকায়
মাসকান	মুসলিম	গৃহনির্মাণ ও বসবাস
নাজুরাত	অভিজাত মুসলিম, সম্মানিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিক সাধক	জীবন নির্বাহ
খানকা	ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক সাধক	খানকা নির্মাণের জন্য
ফাকিরান	ফকির সম্প্রদায়ের দরবেশ	জীবন নির্বাহ
নাজরি দরগাহ	দরগাহ	দরগাহ-এর ব্যবস্থাপনা
তাজিয়াদারি	শিয়া ধর্মকেন্দ্র	মহররম উদযাপনের ব্যয় নির্বাহ
জামিন-ই-মসজিদ	মসজিদ	মসজিদের দৈনন্দিন খরচ মেটানো
খরচি মুসাফিরান	মুসাফির	বিপদগ্রস্ত মুসাফিরের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণ
মারুম্মাতি মসজিদ	মসজিদ	মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ
মাআফি	অভিজাত মুসলিম	জীবন নির্বাহ
পিরান	পীর-মুর্শিদ	জীবন নির্বাহ
খায়রাত		নিঃস্ব মুসলমানের সহায়তা

(Rubbee 1895, 69-70)[১১]

উপর্যুক্ত তালিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি শ্রেণি হল আইমা ও জাগির। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, সৈয়দ বংশসহ অন্যান্য অভিজাত মুসলিমদের জন্য আইমা বরাদ্দ দেয়া হত। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে

১১ উপর্যুক্ত তালিকার বাইরে আরো কয়েক শ্রেণির লাখেরাজ জমি ছিল, যা হিন্দু রাজকর্মচারী, ব্রাহ্মণ ও মন্দিরের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হত; যেমন ব্রাহ্মত্তর, দেবোত্তর, শেওয়াত্তর সুরাজ পর্বত ইত্যাদি। মুসলিম সরকার কতটা জনবান্ধব ও প্রজাহিতৈষী ছিল এবং সুকৃতি লালনে সক্রিয় ছিল, লাখেরাজ জমির তালিকা দেখলেই তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান খন্দকার ফজলে রাব্বি প্রাক-বৃটিশ যুগের আইমা জমির একটি তালিকা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় ৪০০০ এর বেশি ছোট-বড় *আয়মা* স্টেট ছিল (Rubbee 1895, 72)।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারত ও বাংলার মুসলিম শাসকরা সাধারণত বিজিত ভূখণ্ডের ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি কেড়ে নেননি। তাদেরকে খারাজের বিনিময়ে স্বীয় ভূমিতে বহাল রাখা হয়েছিল। তবে বাংলায় বিপুল পরিমাণ পতিত জমি ও ঝোপ-জঙ্গল ছিল। নদীবহুল অঞ্চল হওয়ায় সেগুলো সহজে আবাদি জমিতে পরিণত করা যেত। মালিকানাবিহীন এসব জমি স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে গিয়েছিল। আয়মা ও জায়গিরসহ অন্যান্য শ্রেণির লাখেরাজ জমির কিছু অংশ বরাদ্দ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি হতে দেয়া হত। অর্থাৎ মুসলিম শাসন চালু হওয়ার পর এই শ্রেণির জমির ব্যবস্থাপনায় সর্বপ্রথম মুসলিমরাই সম্পৃক্ত হয়েছে। আর মুসলিমের জমি 'উশরী জমি।

উপর্যুক্ত বিবরণের আলোকে বলা যায়, বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পর যেসব জমিতে খারাজ আরোপের বিনিময়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের বহাল রাখা হয়েছিল, সেগুলো খারাজী জমি; পরবর্তীকালে মালিকানা পরিবর্তন হয়ে মুসলিমদের মালিকানায় আসলেও সেগুলো খারাজী জমি হিসেবে বহাল থাকবে।

অপরদিকে যে জমিগুলো সরকারের মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর লাখেরাজ জমি হিসেবে ওলামা-মাশায়েখ, সুফী-সাধক, ধর্মপ্রচারক, সৈয়দ ও অন্যান্য অভিজাত মুসলিম এবং রাজ-কর্মচারীর অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল, সেগুলো 'উশরী জমি। তাছাড়া সরকারের অনুমতি নিয়ে মুসলিম অধিবাসী কর্তৃক আবাদকৃত পতিত জমি এবং আদি মুসলিম বাসিন্দাদের জমিও 'উশরী জমি বলে গণ্য করতে হবে।

কিন্তু ইংরেজ আমলে বাংলার ভূমিরাজস্বব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। বাংলাদেশের ভূমি 'উশরী না খারাজী, তা নির্ধারণ করতে হলে ইংরেজ আমলের ভূমিব্যবস্থাপনা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু তার আগে আমাদেরকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরতে হবে।

মুসলিম আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনায় 'উশরের অবস্থান

পূর্বের আলোচনার আলোকে বলা যায়, মুসলিম আমলে বাংলায় উভয় প্রকারের ভূমি ছিল। কিন্তু ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোনো সরকারি নথি, রেকর্ড বা বইপত্রে সরকারি বা ব্যক্তিগতভাবে 'উশর আদায়ের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এ বিষয়টি পর্যালোচনা করা উচিত।

আমরা জানি, জমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের যাকাতকে উশর বলে। এটি একটি ফরয ইবাদাহ; এটি আল-কুরআনের আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত এবং এটির পরিমাণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস দ্বারা নির্ধারিত। 'উশর বণ্টনের খাতও সুনির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে খারাজ ইজতিহাদের মাধ্যমে সাব্যস্ত। খারাজের পরিমাণ বেশি এবং এর

ব্যয়ের খাত সুনির্দিষ্ট নয়; ফলে খারাজের মাধ্যমে অধিক রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব হয় এবং রাষ্ট্রের নানাবিধ প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা যায়।

মুসলিম আমলে সমকালীন ঐতিহাসিকগণ ভারত ও বাংলার ইতিহাস নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন মিনহাজ-উস-সিরাজের *তাবাকাত-ই-নাসিরী*, জিয়াউদ্দীন বরনী'র *তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী*, শামস-ই-সিরাজ আফিফ-এর *তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী* প্রভৃতি। তবে রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায় মোগল সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফযল-এর *আইন-ই-আকবরী*তে। ভারত ও বাংলার ইতিহাসের এই উৎসসূত্রগুলোতে এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, এতদঞ্চলে সরকারিভাবে যাকাত ও 'উশর সংগ্রহ করা হত। তাহলে কি বাংলার মুসলমানরা যাকাত ও 'উশর আদায় করত না? নাকি তারা ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করত এবং হানাফী মাযহাবের আলোকে এদেশের ভূমিকে খারাজী বিবেচনা করে 'উশর আদায় হতে বিরত থাকত? আমাদের আলোচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় এ বিষয়ের ওপর আমরা সংক্ষেপে আলোকপাত করব।

মুসলিমদের আর্থিক ইবাদাহ যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ, সংগ্রহ ও বিতরণের পদ্ধতি, রীতি ও ব্যবস্থাপনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়। তাঁর ওফাতের অব্যবহিত পরে প্রথম খলীফা আবু বকর রা.-এর আমলে কিছু মানুষ সরকারি সংগ্রাহকের হাতে যাকাত আদায়ে অস্বীকৃত হয়। খলীফা যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পুনরায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায়ে বাধ্য করেন। প্রথম দুই খলীফার আমলে সকল ধরনের সম্পদের যাকাত সরকারি ব্যবস্থাপনায় সংগৃহীত ও বণ্টিত হত। 'উসমান রা.-এর আমলেও দৃশ্যমান সম্পদের (পশুসম্পদ, ফল-ফলাদি ও কৃষিজ উৎপাদন) যাকাত সরকারিভাবে সংগ্রহ করা হত। কিন্তু তিনি অদৃশ্য সম্পদ তথা স্বর্ণ-রৌপ্য ও নগদ মুদ্রার যাকাত আদায়ের দায়িত্ব সম্পদের মালিকের ওপর ন্যস্ত করেন।

'উসমান রা. এর শাহাদাতের পর সরকারি ব্যবস্থাপনায় যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণে শিথিলতা দেখা যায়, বিশেষত উমাইয়া আমলে কতিপয় অত্যাচারী গভর্নর ও দুরাচারী কর্মচারী যাকাত বণ্টনে আমানতদারি নষ্ট করলে সাধারণ মানুষ সরকারি সংগ্রাহকের হাতে যাকাত প্রদানে অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। ওই সময় যে সাহাবীগণ জীবিত ছিলেন তাঁদের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত বণ্টনের অনুমতি দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ সরকারি কর্মচারীর কাছে যাকাত প্রদান অব্যাহত রাখতে বলেছেন। আবু 'উবাইদ রহ. বলেন,

> عن ابن سيرين كانت الصدقة ترفع – أو قال تدفع – إلى النبي ﷺ أو إلى من أمر به وإلى أبي بكر أو من أمر به وإلى عمر أو من أمر به، وإلى عثمان أو من أمر به. فلما قتل عثمان اختلفوا فكان منهم من يدفعها إليهم ومنهم من يقسمها وكان من يدفعها ابن عمر.
>
> ইবনে সীরীন রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাকাত আদায় করা হত নবী ﷺ বা তাঁর আদিষ্ট কর্মচারীর কাছে, আবু বকর রা. বা তাঁর আদেশপ্রাপ্ত কর্মচারীর কাছে,

> উমার রা. বা তাঁর নির্দেশিত কর্মচারীর হাতে এবং 'উসমান রা. বা তাঁর নিয়োজিত কর্মচারীর কাছে। 'উসমান রা. নিহত হলে মানুষ মতভেদে লিপ্ত হয়; তাঁদের কেউ তাদের (সরকারি কর্মচারীর) কাছে যাকাত আদায় করতেন, আবার কেউ নিজে বণ্টন করতেন। ইবনে উমার (রা.) ছিলেন তাঁদের একজন যারা সরকারি কর্মচারীর কাছে যাকাত আদায় করতেন (Abū 'Ubaid 1989, 675)।

আবু উবায়দ রাহ আরো লিখেছেন, ইবনে উমার রা.-কে যখন বলা হল, গভর্নররা যাকাত সংগ্রহের জন্য অমুসলিম কর্মচারী প্রেরণ করছে, তখন তিনি তাদের হাতে যাকাত না দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত বণ্টনের অনুমতি দিয়েছেন (Abū 'Ubaid 1989, 676)। যাকাত বণ্টনে সরকারি কর্মচারীদের অনৈতিকতার কারণে আরো যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে যাকাত প্রদানের নির্দেশ/অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের মাঝে রয়েছেন ইবনে 'আব্বাস রা., সা'ঈদ ইবনে জুবায়র রাহ, আল-হাসান আল-বাসরী রাহ ও 'উবায়দ ইবনে 'উমায়র রাহ প্রমুখ (Abū 'Ubaid 1989, 676, 679)।

যাকাত আদায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীর আমানতদারি প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার বাস্তবতায় ফিকহের গ্রন্থগুলোতে অত্যাচারী ও ফাসিক শাসকের কাছে যাকাত আদায়ের বৈধতা/অবৈধতা সংক্রান্ত আলোচনা যুক্ত হয়। আবার শাসক যদি যাকাত আদায় ও বণ্টনের দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সাধারণ মুসলমানের কর্তব্য কি-তাও ফিকহের গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয় (cf. Al-Qaradawī, 1973, 745-850)।

আমাদের প্রবল ধারণা, ভারত ও বাংলার শাসকরা জনগণের যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের দায়িত্বে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেননি। বহুবিধ কারণে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়:

প্রথমত : ভারতে মুসলিমের তুলনায় অমুসলিমের সংখ্যা বেশি ছিল। আনুগত্য ও কর প্রদানের শর্তে মুসলিম শাসকরা হিন্দু সামন্তদেরকেও দায়িত্বে বহাল রেখেছিলেন। তাই সরকারি কর্মচারীদের মাঝেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অমুসলিম ছিল, যাদেরকে রাজস্ব সংগ্রহে প্রেরণ করা হত। মুসলিমরা যাকাত ও 'উশর অমুসলিম কর্মচারীদের হাতে অর্পণ করতে স্বস্তিবোধ করতেন না। ফলে যাকাত সংগ্রহ সরকারের জন্য সহজ ছিল না।

দ্বিতীয়ত : যাকাত ও 'উশর সংগ্রহ ও বণ্টন ধর্মীয় কর্তব্য। প্রশাসনযন্ত্রের সম্পূর্ণরূপে ইসলামীকরণ সম্ভব না হওয়ায় সরকার এহেন গুরুভারসম্পন্ন ধর্মীয় কর্তব্য গ্রহণ করতে চায়নি।

তৃতীয়ত : বাংলায় মুসলিম আমলের রাজস্ব ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নে প্রতিভাত হয় যে, শাসকরা ভূমিরাজস্ব আরোপ ও সংগ্রহে সরলীকরণ নীতি অবলম্বন করেছিলেন। বাংলার কোন্ ভূমি খারাজী, আর কোন্ ভূমি 'উশরী তা পৃথকভাবে নিরূপণ করে সেই আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বরং হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবার উৎপাদন হতে খারাজ সংগ্রহ করেছেন। আর বিশেষ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে লাখেরাজ জমি বরাদ্দ করেছেন। যাকাত ও 'উশর সংগ্রহ-বণ্টন ব্যবস্থাপনায় সরকার সম্পৃক্ত হয়নি।

উল্লেখ্য, সরকারিভাবে যাকাত ও 'উশর সংগ্রহ করা না হলে মুসলিমের স্কন্ধ হতে আর্থিক ইবাদাহ-এর বোঝা অপসারিত হয় না। তাদের কর্তব্য হল ব্যক্তিগতভাবে যাকাত ও 'উশর আদায় করা। এ প্রসঙ্গে আমরা ভারতীয় আলিমগণের প্রচেষ্টায় রচিত কোষতুল্য ফিকহী গ্রন্থ *আল-ফাতাওয়া আল-আলমগিরিয়্যাহ*-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য বিবেচনা করতে পারি:

وذكر شيخ الإسلام أن السلطان إذا ترك العشر على صاحب الأرض فهو على وجهين: الأول أن يترك إغفالا منه بأن نسي ففي هذا الوجه كان على من عليه العشر أن يصرف قدر العشر إلى الفقير. والثاني إذا تركه قصدا مع علمه به وأنه على وجهين أيضا. إن كان من عليه العشر غنيا كان له ذلك جائزة من السلطان ويضمن السلطان مثل ذلك من مال بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة. وإن كان من عليه العشر فقيرا محتاجا إلى العشر فترك ذلك عليه جائز وكان صدقة عليه فيجوز كما لو أخذ منه ثم صرفه إليه كذا في الذخيرة.

শায়খুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে, সুলতান যদি 'উশরের বিষয়টি ভূমিমালিকের জন্য রেখে দেন তবে তা দুই ভাবে হতে পারে: (১) অমনোযোগিতার কারণে; এই অবস্থায় যার ওপর 'উশর ওয়াজিব তার দায়িত্ব হল দরিদ্রের জন্য উশরের সমপরিমাণ ব্যয় করা। (২) শাসক যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ও জেনেশুনে তা করেন তাহলে এটিরও দু'টি অবস্থা হতে পারে : (ক) যার ওপর 'উশর ওয়াজিব তিনি যদি ধনী হন, তাহলে সেটি ('উশর) তার জন্য পুরস্কার বলে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে শাসকের কর্তব্য হল সমপরিমাণ সম্পদ খারাজ তহবিল হতে 'উশর তহবিলে স্থানান্তর করা। (খ) আর যার ওপর 'উশর ওয়াজিব তিনি যদি দরিদ্র হন, 'উশরের প্রতি মুখাপেক্ষী হন, তবে তার কাছ থেকে 'উশর আদায় না করা জায়েজ; এটি তার জন্য সাদাকাহ বলে গণ্য হবে, যেন শাসক তার থেকে নিয়ে তাকেই দিয়ে দিলেন (Shaikh Nizam, 1310 H. 2: 240)।

ভারত ও বাংলার ইতিহাসে কখনো এটা জানা যায়নি যে, শাসকগণ জনগণের 'উশর মওকুফ করার ঘোষণা দিয়েছেন বা 'উশর নামীয় পৃথক কোনো তহবিল গঠন করে তাতে খারাজ তহবিল হতে 'উশরের সমপরিমাণ অর্থ স্থানান্তর করেছেন। তাই এটি ধরে নেয়া যায় যে, গুরু দায়িত্ব এড়ানো বা অমনোযোগিতা বা অজ্ঞতা কিংবা ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে তারা 'উশর আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। অতএব বলা যায়, 'উশর আদায়ের দায়িত্ব ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু বিচ্ছিন্ন কিছু দৃষ্টান্ত ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে 'উশর আদায়ের কোনো সংস্কৃতি ছিল বলে আমরা জানতে পারিনি। হানাফী মাযহাব মতে, একই জমির উৎপাদন হতে খারাজ ও 'উশর আদায় করা যায় না। বাংলার শাসকরা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জমির ওপর খারাজ আরোপ করতেন বিধায় এতদঞ্চলের মুসলিমরা হয়ত 'উশর আদায়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

'উশর ও খারাজ আরোপের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ভূমির শ্রেণি নিরূপণ করতে হলে আমাদের আরো দু'টি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে : ক) বৃটিশ আমলের ভূমি ব্যবস্থা, বিশেষত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; খ) ১৯৫১ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন এবং জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও খারাজ ব্যবস্থার বিলুপ্তি

মোগল আমলে প্রজারা/কৃষকেরা ছিল বাংলার জমির মালিক; তারা স্বাধীনভাবে বেচাকেনা ও অন্যবিধ বৈধ উপায়ে জমি হস্তান্তর করতে পারত। বাদশাহ বা শাসক ছিলেন জমির রাজস্বের মালিক। আর জমিদার ছিল কেবল রাজস্বসংগ্রাহক। তারা কেবল সরকার-নির্ধারিত রাজস্ব সংগ্রহ করে কোষাগারে জমা দিত। জমিদাররা নিজস্ব ক্ষমতাবলে রাজস্ব আরোপ বা রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারত না; কৃষকদের মালিকানা কেড়ে নিতে পারত না। অনেকে মনে করেন, সার্বভৌমত্বের সূত্রে জমির মালিক ছিল বাদশাহ; কৃষকেরা ছিল ব্যবহারিক মালিক ও জমিদাররা রাজস্ব সংগ্রাহক। তাত্ত্বিকভাবে যা-ই বলা হোক না কেন, কৃষকেরা তাদের জমির যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারতেন। এমনকি মোগল বাদশাহগণ দুর্গ, মসজিদ, গোরস্তান বা অন্যকোনো স্থাপনা নির্মাণে কৃষকদের কাছ থেকে জমি কিনে নিতেন। এতেই বোঝা যায়, কৃষকেরাই ছিল জমির ব্যবহারিক মালিক (Islam 2013, 126; Hoque 2016, 36)।

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজরা বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে। তারপর মুর্শিদাবাদের মসনদে কয়েকজন নবাব আসা-যাওয়া করেন, যাদের প্রায় সবাই ছিলেন ইংরেজদের হাতের পুতুল। ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা মোগল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানি লাভ করে। কয়েক বছর দ্বৈত শাসন চলার পর ১৭৭২ সালে ইংরেজরা নিরঙ্কুশভাবে বাংলার ক্ষমতার মালিক হয়ে যায়।

ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্য ছিল বিলাত হতে পুঁজি না এনে এদেশ হতে তাদের ব্যবসার পুঁজি সংগ্রহ করে এদেশেই ব্যবসা করে লভ্যাংশ স্বদেশে প্রেরণ করা। কিন্তু ক্ষমতা দখলের পর নানা চেষ্টা সত্ত্বেও তারা কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। তারপর নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চুক্তি চালু করে, যা বাংলার ভূমি-কৃষকের সম্পর্ক বহু বছরের জন্য বদলে দেয়।

১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করে আইন জারি করেন। এই আইনের বলে জমিদারকে জমির মালিক বলে ঘোষণা করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণকারী জমিদার ও তালুকদারদের উপর ধার্যকৃত সরকারি জমা চিরকালের জন্য অপরিবর্তনীয় থাকবে বলে ঘোষণা দেয়া হয় (Islam 2013, 124)। কৃষকদের ওপর ইচ্ছেমত ভূমিকর আরোপ, আদায় ও হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতা লাভ করে জমিদাররা। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার কর আরোপের ক্ষমতা লাভ করে তারা, যেমন জলকর, ঘাসকর, বনকর ও খনিজকর ইত্যাদি (Haque 1991, 4)। এক কথায় জমিদার হয়েছিল জমির সর্বস্বত্বের মালিক (Islam 2002, 212)। পূর্বে কৃষক ছিল

জমির মালিক বা ব্যবহারিক মালিক; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর সে জমির মালিকানা হতে বঞ্চিত হয়ে ভূমিদাসে পরিণত হয়। আর জমিদারের ব্যাপক ক্ষমতার কারণে বলা যায়, ভূমিদাস প্রজাদের ওপর দুই স্তরের মালিক বা সরকার চেপে বসে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে একটিই কঠিন বিধান ছিল, বৎসরে বারো কিস্তিতে দেয় সরকারি-রাজস্ব কিস্তি বাকি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার জমি নিলামে চড়িয়ে বকেয়া রাজস্ব আদায় করবে এবং কোনো অবস্থাতেই এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটবে না (Islam 2013, 124-25; Islam 2002, 229)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারদের অত্যাচারের কারণে বাংলার কৃষক সমাজের ওপর ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছিল। ভূমিমালিক রাতারাতি পরিণত হয়েছিল ভূমিদাসে। কৃষকেরা যেন 'ভাড়া'র মাধ্যমে জমি চাষ করার সুযোগ পায়, জমিমালিক বা জমিদার ইচ্ছেমত জমির ভাড়া বাড়ানোর অধিকার পায়, অথচ জমিদারের জমা ছিল চিরস্থায়ীভাবে অপরিবর্তনীয়। স্পষ্টত এর মাধ্যমে খারাজব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে।

লাখেরাজ জমির ক্রমসংকোচন

বাংলার শাসনক্ষমতা গ্রহণ করার পর ইংরেজরা আশানুরূপ রাজস্ব আদায় করতে পারেনি। নানা রকমের জরিপের পর তারা এর কারণ নির্ধারণ করেন। রাজস্ব কম আদায় হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল বিপুল পরিমাণ লাখেরাজ জমি, যা হতে সরকার কোনো রাজস্ব পায় না, কিংবা নামমাত্র রাজস্ব আদায় করতে পারে। তাই তারা লাখেরাজ জমি বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে কলমের এক খোঁচায় বিপুল পরিমাণ নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব ছিল না। তাই তারা নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করে লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত বা সংকোচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৭৯৩ সালের ১৯ নং রেজুলেশনের মাধ্যমে দশ বিঘার চেয়ে বড় লাখেরাজ সম্পত্তি সরকারের দখলে নেয়ার বিধান জারি করা হয়, যদি ওই সম্পত্তির ভোগদখলকারী তার অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের রাজকীয় সনদ প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়। এই বিধানবলে অনেক প্রকৃত লাখেরাজ জমিকে কেবল সনদ প্রদর্শন করতে না পারায় সরকারি ভূমিতে পরিণত করা হয় (Rubbee 1895, 74)।

১৭৯৩ সালের ৩৭ নং রেজুলেশনের মাধ্যমে ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্টের পরবর্তী লাখেরাজ বরাদ্দগুলো বাতিলের বিধান জারি করা হয়। মোগল আমলের লাখেরাজ সম্পত্তিগুলোর বরাদ্দের অনুকূলে সনদ প্রদর্শন করতে পারলে এবং ওই তারিখের পূর্বে বৈধভাবে দখল করতে পারলে সেগুলো বহাল থাকবে বলে ঘোষণা দেয়া হয় (Islam 2013, 128-29; Hoque 2016, 60)।

১৮১৯ সালে লাখেরাজ সম্পত্তির সরকারের কব্জায় নেয়ার চূড়ান্ত বিধি জারি করা হয়। এই বছরের ২ নং রেজুলেশনের ২৮ ধারায় এই বিধান জারি করা হয় যে, লাখেরাজ ভূমির ভোগদখলকারীর হাতে থাকা সনদ ওই সম্পত্তির ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট হবে না; বরং তা দাপ্তরিক ডকুমেন্ট দ্বারা যাচাই করতে হবে এবং জীবিত কোনো সাক্ষী দ্বারা সত্যায়ন করতে হবে। বলাবাহুল্য, এহেন কঠিন শর্ত

পালন করতে না পারায় বহু লাখেরাজ জমি সরকারের মালিকানায় চলে যায় (Rubbee 1895, 74)।

এভাবে পর্যায়ক্রমে বাংলার ভূমিব্যবস্থা হতে মুসলিম আমলের বৈশিষ্ট্য লোপ পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিতে জমিদারের একচ্ছত্র মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হলে খারাজ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। ক্রমান্বয়িক কঠোর বিধান আরোপের মাধ্যমে লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত করে তাত্ত্বিকরূপে হলেও যে 'উশরী জমি ছিল, তার বিনাশ সাধন করা হয়।

এই প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপ্রকৃতি নিয়ে 'আলিমগণের মাঝে বিতর্ক হয়। অনেকে এটিকে দারুল হারব বলে চিহ্নিত করে কিছু বিধান স্থগিত রাখার কথা বলেন। এই অভিমত ভূমিব্যবস্থাপনায়ও আরোপ করার পক্ষে অভিমত দেয়া হয়। পুরনো কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে দাবি করা হয় যে, দারুল হারবে 'উশর বা খারাজ কোনটাই আরোপ করা হয় না। তাই ভারতের জমিতেও তা প্রযোজ্য নয়।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জন এবং ১৯৭১ সালে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাবের পর ঔপনিবেশিক বাস্তবতার অবসানে আমরা দারুল হারব/দারুল ইসলামের বিতর্ক এড়িয়ে যেতে পারি। ইংরেজ আমলকে আমরা ত্রয়োদশ শতক হতে শুরু হয়ে অব্যাহতভাবে চলমান মুসলিম শাসনের মাঝে একটি 'ব্যতিক্রমী অন্তর্বর্তীকাল' হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের জমির শর'ঈ প্রকৃতি নির্ধারণে ১৯৫০ সালের **রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন** বিবেচনায় নিয়ে চূড়ান্ত মতামত জ্ঞাপন করা যায়।

১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন এবং জমিদারি প্রথার অবসান

ব্রিটিশ শাসনের শেষের দিকে জমিদারি প্রথা বাতিলের জন্য দাবি উত্থাপিত হয়। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনের প্রচারণাকালে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রতিশ্রুতি দিলেও সরকার গঠনের পর জমিদারি প্রথা বাতিল করতে পারেননি। অবশেষে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সালে প্রাদেশিক আইন সভায় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (State Acquisition and Tenancy Act, 1950) আইন পাশ হয় এবং গভর্নর জেনারেলের সম্মতি লাভের পর ১৯৫১ সালের ২৮ নং আইনে পরিণত হয়। এই আইনের বলে ১৯৫৬ সালে সর্বপ্রকার মধ্যস্বত্ব বিলোপ করা হয়েছিল।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা প্রজাদের সরকারের অধীন হতে জমিদারের অধীনে ন্যস্ত করার একশত তেষট্টি বৎসর পর প্রজারা আবারো সরকারের অধীনে সরাসরি ন্যস্ত হয়েছিল এবং কুখ্যাত জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়েছিল (Hoque 2016, 126-27)।

খারাজ ব্যবস্থা ফিরে আসেনি

জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির মাধ্যমে জমির ওপর সরকারের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হল। আগের মতই জনগণ জমির ব্যবহারিক মালিক বা ভোগদখলের অধিকারী হলেন। কিন্তু খারাজ ব্যবস্থা ফিরে আসেনি। খারাজ আল-ওযীফাহ বা খারাজ আল-মুকাসামা-

কোনো প্রকারের খারাজই পুনরায় প্রবর্তিত হয়নি। জনগণ স্বাধীনভাবে নিজ মালিকানাধীন জমির ভোগদখল ও আইনানুগ হস্তান্তর করতে পারে। বিনিময়ে সার্বভৌম মালিকানার কারণে সরকারকে নামেমাত্র খাজনা আদায় করে, যার পরিমাণ অতি নগণ্য।

খাজনা নিশ্চিতভাবে খারাজের বিকল্প নয়

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার জনগণের কাছ থেকে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে, যা সাধারণ মানুষের নিকট জমির খাজনা নামে সমধিক পরিচিত। এই করের পরিমাণ এতই সামান্য যে, এটি কখনো ইসলামী অর্থব্যবস্থার খারাজের বিকল্প হতে পারে না। নিম্নের প্রতিতুলনায় সেটা পরিষ্কার হবে:

পরিমাণ: খারাজ ও খাজনার মাঝে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল পরিমাণগত। খারাজ আল-মুকাসামা-এর সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদনের অর্ধেক, আর সর্বনিম্ন পরিমাণ এক পঞ্চমাংশ। খারাজ আল-ওয়াযিফা-এর ক্ষেত্রেও এই সীমা বিবেচনায় রাখতে হয়। পক্ষান্তরে খাজনার পরিমাণ এতটা নগণ্য যে, তা উল্লেখ করার মত নয়, তুলনা তো দূরের ব্যাপার।

হারের তারতম্য : জমিভেদে খারাজের হার বিভিন্ন হয়। জমির উর্বরতা, সেচসুবিধা, পানির প্রাপ্যতা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে খারাজ নির্ধারণে তারতম্য করা হয়। অর্থাৎ উৎপাদন বেশি হলে খারাজ বেশি ধার্য করা হয়, উৎপাদন কম হলে খারাজ কম ধার্য করা হয়। কিন্তু খাজনার ক্ষেত্রে উৎপাদন নয়; বরং জমির মূল্য বিবেচনা করা হয়, গ্রামের জমির খাজনা কম হয়, শহরের জমিতে কোনো উৎপাদন নেই, তবুও বেশি পরিমাণে খাজনা ধার্য করা হয়।

পরিবর্তনশীলতা : খাজনা পরিবর্তনশীল; জমির মূল্য বৃদ্ধির ভিত্তিতে সময়ে সময়ে আইন জারি করে সরকার খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে নেয়। এক্ষেত্রে জনগণের মতামত নেয়া হয় না। খাজনার হার কম হওয়ায় এ বিষয়ে জনগণের খুব একটা মাথাব্যাথা নেই। পক্ষান্তরে খারাজের পরিমাণ মোটামুটি অপরিবর্তনীয়। একবার খারাজ আরোপ করার পর তা বাড়ানো যায় না। জমির উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা কমে গেলে কৃষকের আবেদনের প্রেক্ষিতে খারাজ হ্রাস করা যায়; কিন্তু বৃদ্ধি করা যায় না।

জমির প্রকার : খাজনা আরোপের ক্ষেত্রে জমির প্রকার বা শ্রেণি বিবেচনায় নেয়া হয় না, কৃষি, অকৃষি জমি, আবাসিক এলাকা, শিল্প প্লট, ভিটেবাড়ি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন পতিত ভূমির ওপর খাজনা আরোপ করা হয়। কিন্তু চাষযোগ্য জমি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির জমির ওপর খারাজ আরোপ করা হয় না।

'উশরী জমিতে খারাজ নেই : বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার যদি কোনো পতিত জমি কোনো মুসলিমের অনুকূলে বরাদ্দ দেন এবং সে যদি প্রাকৃতিক পানি দ্বারা চাষাবাদ করে তবে তা 'উশরী জমি বলে গণ্য হবে। এ জমির ওপর খারাজ আরোপ করা যাবে না। কিন্তু বরাদ্দ দেয়া জমির ওপর খাজনা ধার্য করা হয়।

দুর্যোগে মওকুফ করা : কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে, যেমন অতিবৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অনাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদির কারণে ফসল নষ্ট হলে খারাজ মওকুফ করা হয়। কিন্তু উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় এসব কারণে খাজনা মওকুফ করা হয় না।

বকেয়া আদায় : খাজনার হার কম হওয়ায় সাধারণত প্রজারা বছর বছর খাজনা আদায় করে না; এতে খাজনা মওকুফ হয় না; বরং বকেয়াসহ আদায় করতে হয়। কিন্তু খারাজ বকেয়া পড়লে তা মওকুফ করা হয়, কেবল সর্বশেষ বছরের খারাজ আদায় করা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, খাজনা কিছুতেই খারাজের বিকল্প হতে পারে না। আর তাই বর্তমানে বাংলাদেশে আমরা যে ভূমিকর আদায় করছি তার মাধ্যমে খারাজ আদায় হচ্ছে না।

বাংলাদেশের ভূমি 'উশরী না খারাজী

ওপরের পৃষ্ঠাগুলোতে ত্রয়োদশ শতক হতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত ভূমিব্যবস্থাপনার বিবর্তন অতি সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মুসলিমদের প্রথমবারের মত সম্পৃক্ত হওয়ার বিবেচনায় বলা যায়, এদেশে খারাজী ও উশরী - দুই প্রকারের জমি আছে:

বাংলাদেশের খারাজী জমি

বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে (বরেন্দ্র, বঙ্গ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ইত্যাদি) মুসলিম বিজয়ের পর পর স্থানীয় অমুসলিম বাসিন্দাদের যে ভূমিতে খারাজ আদায়ের শর্তে বহাল রাখা হয়েছিল সেগুলো খারাজী জমি।

বাংলাদেশের উশরী জমি

উপরের বিস্তৃত আলোচনার আলোকে বলা যায়,

ক. মুসলিমদের সামরিক বিজয়ের পূর্ব থেকেই বাংলায় যে মুসলিমরা বসবাস করে আসছিল তাদের জমি 'উশরী;

খ. বিজয়ের পর সরকারের বরাদ্দ নিয়ে বা অনুমতি নিয়ে মুসলিমরা যে পতিত জমি আবাদ করেছে তাও উশরী জমি;

গ. সরকার কর্তৃক আলিম-ওলামা, সুফী-সাধক, অভিজাত ব্যক্তি ও সরকারি কর্মচারীদের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া লাখেরাজ জমি উশরী জমি বলে পরিগণিত।

মুসলিম বিজয়ের পর প্রায় আটশ' বছর অতিবাহিত হয়েছে। শত শত বছর আগে অনেক বরাদ্দ মৌখিকভাবে দেয়া হত। কিংবা লিখিত বরাদ্দ দেয়া হলেও তার সনদ এতদিন সংরক্ষিত থাকার কথা নয়। মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে কেনাবেচা, এওয়াজ-বদলসহ অন্যান্য সূত্রে জমির হস্তান্তর খুবই স্বাভাবিক বিষয়। ব্রিটিশ আমলে অনেক লাখেরাজ জমি হতে প্রকৃত মালিককে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুসলিম যেমন খারাজী ভূমির মালিক হয়েছে, তেমনিভাবে অমুসলিমও 'উশরী জমির মালিক হয়েছে। এতদিন পর আদিতে কোন্ জমিটি উশরী ছিল, আর কোন্ জমিটি খারাজী ছিল তা নির্ণয় করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আর আমরা জানি, 'উশরী ও

খারাজী হওয়ার দৃষ্টিতে জমির বিভাজন প্রথম মুসলিম বিজয়ের সময় হয়ে থাকে, যা আর পরিবর্তন করা যায় না। মোদ্দাকথা বাংলাদেশে 'উশরী জমি যেমন আছে, তেমনি খারাজী জমিও আছে; কিন্তু বর্তমানে সেগুলো পৃথকভাবে চিহ্নিত করা অসম্ভব।

'উশর বা খারাজ -কোনটাই কি বাংলাদেশে আদায় করা হয়?

এমতাবস্থায় বাংলাদেশে 'উশর বা খারাজ কোনটাই আদায় করা হচ্ছে না।

খারাজঃ বাংলাদেশের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে, সকল নাগরিকের সব ধরনের জমি তথা কৃষি, অকৃষি জমি, বসতভিটা ও শিল্পপ্লটের ভূমিকর দিতে হয়। আমরা ইতোপূর্বে প্রমাণ করেছি যে, ভূমিকর কোনোভাবেই খারাজের বিকল্প হতে পারে না। অর্থাৎ বাংলাদেশের ভূমির উৎপাদন হতে খারাজ আদায় করা হয় না। শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর কোনো মুসলিম দেশেই ফসলি জমির খারাজ আদায় করা হয় না।

'উশর : আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশে সরকারিভাবে 'উশর আদায় করা হয় না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কি 'উশর আদায় করা হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট উপাত্ত নেই। তবে আমরা যতটুকু জানি, অত্যন্ত বিরল ব্যতিক্রম ব্যতীত বাংলাদেশের মুসলিমরা সাধারণত 'উশর আদায় করে না। বাংলাদেশের ধর্মালোচনা এমনিতে আর্থিক ইবাদাহ-এর স্থান কম। তবুও যাকাত ও দান-সাদাকাহ নিয়ে কিছুটা আলোচনা হয়, কিন্তু 'উশর সম্পর্কে কোনো আলোচনা হয় না।

খুব সম্ভবত সুলতানি ও মোগল আমল হতে এ সংস্কৃতি চলে আসছে। শাসকরা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জমি হতে খারাজ আদায় করতেন। হানাফী মাযহাবের আলোকে একই জমিতে 'উশর ও খারাজ আরোপ করা যায় না। তাই মুসলিমরা মনে করত, যেহেতু খারাজ আদায় করা হচ্ছে, সেহেতু উশর আদায়ের প্রয়োজন নেই। এভাবে হয়তো 'উশরের বিষয় ধর্মালোচনায় অনুপস্থিত থেকে যায়।

এখন করণীয়

মুসলিমের জমির উৎপাদন হতে 'উশর বা খারাজ আদায় না করা ইসলামী বিধানের লংঘন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে 'উশর আদায় না করার যে সংস্কৃতি আমাদের দেশে চালু হয়েছে তার অবসানে আমরা নিম্নের যে-কোনো একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

১. উশরী ও খারাজী জমি চিহ্নিত করে খারাজী জমির খারাজ ও 'উশরী জমির উশর আদায় করা

প্রথমত, 'উশরী জমি চিহ্নিত করে তা হতে 'উশর আদায় করা এবং খারাজী জমি চিহ্নিত করে তা হতে খারাজ আদায় করা। এটি করতে হলে সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার আবাদি জমির মালিকানার হস্তান্তর ও ভোগদখলের আট শত বছরের ধারাবাহিক রেকর্ড সংগ্রহ করতে হবে। এটি যে অসম্ভব, তা প্রমাণের জন্য যুক্তি উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই।

কেউ যদি সরকার কর্তৃক গৃহীত খাজনাকে খারাজের বিকল্প বলে দাবি করতে চায়, তাহলে তাকে সর্বনিম্ন পরিমাণ খারাজ আদায় করতে হবে। যেহেতু সরকার নামমাত্র খাজনা নেয় তাই খারাজের বাকি অংশ অর্থাৎ উৎপাদনের ২০% থেকে খাজনা বাদ

দিয়ে অবশিষ্ট অংশ নিজের দায়িত্বে খারাজের শর'ঈ খাতে ব্যয় করতে হবে। তাহলেই কেবল 'উশর হতে অব্যহতি পাওয়া সম্ভব। মুফতি মুহাম্মদ শফী বলেন,

> আর পাকিস্তানের মুসলমানগণ নিজেদের খিরাজি ভূমির খিরাজ পাকিস্তান সরকারের খাজনা ট্যাক্সের নিয়মে দিয়েও দায়িত্ব মুক্ত হতে পারে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, খিরাজের পরিমাণ অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের এক-পঞ্চমাংশ (২০%) পুরোপুরিই সরকারি খাজনা ট্যাক্সে যেতে হবে। সরকারী খাজনা ট্যাক্স যদি এর চেয়ে কম হয় তবে কম পরিমাণ খিরাজ তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে আদায় করে তা খিরাজ খাতে ব্যয় করতে হবে (Shafī 1995, 210)।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা যেতে পারে। মনে করি এক একর জমিতে উৎপাদিত ফসলের মূল্য ৫০,০০০/= টাকা। খারাজের সর্বনিম্ন পরিমাণ ১০,০০০/= টাকা (২০%)। আরো মনে করি এক একর জমিতে সরকারি খাজনার পরিমাণ ১০০/= টাকা। এখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি খারাজ আদায় করতে চায় তবে তাকে সরকারি খাজনা আদায়ের পর আরো ৯৯০০/= টাকা খারাজের খাতে ব্যয় করতে হবে। তাহলেই কেবল তার খারাজ আদায় হবে। এভাবে খারাজ প্রদান করলেই কেবল সে 'উশর আদায় হতে অব্যহতি পাবে।

২. মুসলিমের মালিকানাধীন সকল আবাদি জমির উৎপাদন হতে 'উশর আদায় করা

দ্বিতীয় উপায় হল: বাংলাদেশে মুসলিমদের মালিকানায় যে জমি আছে তার খারাজী-'উশরী বিভাজন না করে তা হতে 'উশর আদায় করা। বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, এটি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। একজন মুসলিম তার জমির উৎপাদনের 'উশর আদায় হতে কেবল তখনই পরিত্রাণ পেতে পারে যদি তার জমি হতে খারাজ আদায় করা হয়। বাংলাদেশে কোনো জমির উৎপাদন হতে খারাজ আদায় করা হয় না। অতএব 'উশরী ও খারাজী জমির বিভাজনের অসম্ভব কাজ সম্পাদনে চেষ্টা বিনিয়োগ না করে মুসলিমদের জমির উৎপাদন হতে 'উশর আদায় করা সমীচীন। নয়ত এই আর্থিক ইবাদাহ আদায় হবে না।

কেউ হয়ত আপত্তি তুলতে পারেন, হানাফী মাযহাব মতে খারাজী জমিতে 'উশর আরোপ করা যায় না। এ আপত্তির জবাব আগেই দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে খারাজী ও 'উশরী জমি মিশ্রিত হয়ে আছে, যদি পৃথক করা সম্ভব হয় উশরী জমি হতে 'উশর আদায় করা হোক। খারাজী জমি হতে খারাজ তথা উৎপাদনের কমপক্ষে ২০% আদায় করে দিতে হবে। ভূমিকরের দোহাই দিয়ে কোনোভাবেই 'উশর বা খারাজ আদায় না করার সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। 'উশর আর্থিক ইবাদাহ, যাকাতের মতই ফরয। কিন্তু খারাজ ধর্মীয় কর্তব্য নয়, বরং রাষ্ট্রীয় কর। কালক্রমে খারাজ ব্যবস্থা যদি পরিত্যক্ত হয়, সেটা পুনরায় প্রবর্তন করা অপরিহার্য নয়। খারাজ প্রবর্তনের প্রথম ইতিহাস হতেও আমরা এটা জানতে পারি। ইরাকের বিজিত ভূমি বিজয়ী যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টনের দাবি উঠেছিল। যদি তা করা হত তাহলে চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট কিছু

ব্যক্তি ও তাদের উত্তরাধিকারীরা ওই ভূমির ভোগদখলের অধিকার লাভ করত। কিন্তু 'উমার (রা.) স্থানীয়দের বহাল রেখে তাদের ওপর খারাজ আরোপ করলেন, যাতে বছরের পর পর ওই ভূমির খারাজ সংগ্রহ করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আয়বৃদ্ধি করা যায়। এভাবে নির্দিষ্ট মানুষের ভোগদখলের পরিবর্তে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। এটি ছিল রাষ্ট্রপরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিধিব্যবস্থা।

আধুনিক যুগের পূর্বে খারাজই ছিল রাষ্ট্রীয় আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস। কিন্তু বর্তমান যুগে রাষ্ট্রীয় আয়ের বহুবিধ খাত উদ্ভাবিত হয়েছে, যা পূর্বের যুগে ছিল না; যেমন আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, উৎসকর, রেজিস্ট্রি ফি, আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক ইত্যাদি। এমতাবস্থায় সরকার ভূমিকরের ওপর মোটেও নির্ভরশীল নয়। তাই খারাজ ব্যবস্থা অবলোপ করে নামমাত্র খাজনা চালু রাখা হয়েছে। একটি রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা রাষ্ট্রের সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে অবলুপ্ত হয়েছে। তাই এটি পুনরায় চালু করার কোনো ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু 'উশর তো মানবপ্রবর্তিত কোনো ব্যবস্থা নয়; এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ইবাদাহ, যা অবলুপ্ত করার অধিকার কারো নেই। এমতাবস্থায় অচল হয়ে যাওয়া একটি বিধিব্যবস্থার (খারাজ) দোহাই দিয়ে কিছুতেই 'উশর হতে নিস্তার পাওয়া যাবে না। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বর্তমানে যে খাজনা নেয়া হয় এটি কিছুতেই খারাজ হতে পারে না; বরং নামমাত্র ভাড়া যা কৃষি-অকৃষি সকল জমি হতে নেয়া হয়। খারাজের পরিবর্তে নামমাত্র ভাড়া আদায়ের কারণে জমির প্রকৃতি পরিবর্তন হয় এবং সেটি আর খারাজী থাকে না। খারাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, এটি প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ইবনুল হুমামও স্বীকার করেছেন, তিনি বলেন, পুনরায় খারাজ আরোপ করে সেটিকে নতুন করে খারাজী ভূমি বানানোর প্রয়োজন নেই:

> أن الخراج قد ارتفع عن أراضي مصر إنما المأخوذ منها أجرة فصارت الأرض بمنزلة دور السكنى لعدم من يجب عليه الخراج. فإن اشتراها انسان من الإمام بشرطه شراء صحيحا ملكها ولا خراج عليها، لأن الإمام قد أخذ البدل للمسلمين.
>
> মিশরের ভূমি হতে খারাজ উঠে গেছে, তা হতে তো উজরা বা ভাড়া আদায় করা হয়; ফলে খারাজ ওয়াজিব হওয়ার পাত্রের অবর্তমানে তা বসবাসের বাড়ি হিসেবে গণ্য হবে। অতএব কোনো মানুষ শাসকের কাছ থেকে সব শর্ত পূরণ বিশুদ্ধভাবে সে জমি ক্রয় করে তবে সে ওইটার মালিক হবে এবং তার ওপর কোনো খারাজ আসবে না। কারণ ইমাম মুসলিমদের জন্য বিকল্প গ্রহণ করেছেন (Ibn Nujaim ND., 5: 115)।

বস্তুত এখন মুসলিম বিশ্বের কোথাও খারাজ ব্যবস্থা চালু নেই। তাই খারাজী ও 'উশরী ভূমি বিভাজনের মাধ্যমে 'উশর হতে পরিত্রাণ লাভের সুযোগ নেই। আর তাই ভূমির বিভাজন ব্যতীত সব শ্রেণির জমির উৎপাদন হতে 'উশর আদায় করতে হবে। আধুনিক যুগের প্রখ্যাত ফকীহ ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভীর *ফিকহুয যাকাত* গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের প্রবন্ধ শেষ করছি। তিনি বলেন,

> والواقع أن الحكومات الحديثة الآن أصبحتْ تفرض على كافة الأراضي الزراعية ضريبة عقارية خاصة غيرناظرة إلى ما كان أصله عشريا أو خراجيا، فاستوتْ كل الأراضي في ذلك. لهذا كان الأوفق بالواقع العملي هو إيجاب العشر أو نصفه على كل أرض يملكها مسلم، إذا أخرجت النصاب المشروط للزكاة، وتكون الضريبة العقارية على رقبتها يدفعها من يملكها والعشر أو نصفه على إنتاجها من الثمر والزرع.
>
> বাস্তবতা হলো, আধুনিক সরকারগুলো কোন্ জমি আদিতে উশরী ছিল বা কোন্টা খারাজী ছিল তা বিবেচনা না করে এখন সমস্ত কৃষিভূমিতে বিশেষ ধরনের ভূমিকর আরোপ করে। এক্ষেত্রে সব জমি সমান হয়ে যায়। তাই প্রায়োগিক দিকের বিচারে মুসলিম-মালিকানাধীন সব জমিতে 'উশর বা অর্ধ-'উশর আরোপ করাই যথার্থ, যদি উৎপন্ন ফসল যাকাতের নিসাব পরিমাণ হয়। ভূমির মালিক ভূমিকর আদায় করবে আর ফল ও ফসলজাত উৎপাদন হতে 'উশর বা অর্ধ-'উশর আদায় করা হবে (Al-Qaradawi, 418)।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় খারাজের বিধান প্রয়োগের ইতিহাস ও বর্তমান বাস্তবতা অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি 'উশর ও খারাজের মৌলিক বিধানগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনার ভূমি ব্যবস্থার বিশ্লেষণে দেখা যায়, এদেশে 'উশরী ও খারাজী - উভয় শ্রেণির জমি ছিল, যদিও শাসকরা ভূমির প্রকার বিবেচনা না করে সব ধরনের জমির ওপর খারাজ আরোপ করেছেন। ইংরেজরা বাংলার ক্ষমতা দখলের পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদেরকে ভূমির মালিক বানিয়ে দেয় এবং খারাজ ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে। ব্রিটিশদের বিদায়ের পর ১৯৫১ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলেও খারাজ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়নি। এমতাবস্থায় আমাদের জোরালো অভিমত এই যে, কৃষিজ উৎপাদনের ওপর আল্লাহ তাআলা যে 'হক' আরোপ করেছেন তা আদায় করার জন্য বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিকদের মালিকানাধীন সকল ভূমির উৎপাদন হতে 'উশর আদায়ের কোনো বিকল্প নেই।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Abū 'Ubaid (1989). *Kitāb al-Amwāl*. Beirut & Cairo: Dār al-Shurūq.

Abū Dāūd. 2007. *Sunan Abī Dāūd*. Vol. 2. Dhaka: Bangladesh Islamic Centre.

Abū Yūsuf, Ya’qūb ibn Ibrāhīm ibn Ḥabīb al-Anṣārī al-Kūfī.1979. *Kitāb al-Kharāj*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

Al-‘Ainī, Badruddīn.1999. Al-Bināya. v. 7. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Barakatī, ‘Amīmul Ihsān al-Mujaddidī. 2003. Al-Ta‘rifat al-Fiqhiyyah. Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah.

Al-Bukhārī, Abū ʿ Abdullah Muhammd ibn Ismāʿīl. 2001. *Al-Jāmiʿal-Musnad al-Sahīh*.. Vol. 1. Cairo: Dār al-Hadīth.

Ali, Muhammad Mohar. 1985. *History of the Muslims of Bengal*. Riyadh: Imam Muhammad Ibn Sa‘ud Islamic University.

Al-Kasānī (2003). *Badai‘ al-Sanai‘*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Marghīnānī, Abū al-Hasan Burhān al-Dīn ʿAli ibn Abu Bakr ibn ʿAbd al-Jalīl al-Farghānī. 1417 H. *Al-Hidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī*. Vol. 2. Karachi: Idarāh Al-Qurān Wa Al-‘Ulūm al-Islāmiyyah.

Al-Mas‘udī .2005. *Murūz al-Zahab*. Beirut & Sidon: Al-Maktabah al-‘Asrīyyah.

Al-Qaradawī, Yūsuf. 1973. *Fuqh al-Zakāt*. Beirut: Muassasa al-Risalah.

Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abū Sahl. 1989. *Kitāb Al Mabsuṭ*. Bairut: Dār al-Ma’rifah

Al-Sirafī, Abu zaid (1999). *Rihla al-Sirafī*. (Abu Dhabi: Al-Majma‘ al-Thaqāfi.

Al-Thanovi, Mohammad A‘la. N.D. *Ahkam al-Aradi*. DU Library Manuscript, call no. 343

Al-Zuhailī, Wahbah Mustafā. 1985. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū.* Beirut: Dār al-Fikr.

Haq, Mohammad Enamul. 2011. *Bange Sufi Probhab*. Dhaka: Ramon Publishers.

Haque, Md Nurul.1991. *Bhumi Ain O Alochona*. Dhaka.

Hoque, Kazi Ebadul. 2016. *Bhumi Ayin O Bhumi Bymasther Kramabikash*. Dhaka: Bangla Academy.

Ibn Ādam, Yahyā. 1979. *Al-Kharāj*. Beirut: Dār Al-M‘arifah.

Ibn al-Humām, Kamāluddin. 2003. *Sharh Fath al-Qadir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Battuta.1987. *Rihla ibn Battutah*. Beirut: Dār Ihya al-‘Ulum.

Ibn Khurdajbeh. 1967. *Kitāb al-Masālik wa al-Mamālik*. Leiden: E. J. Brill.

Ibn Nujaim, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm Ibn Nujaim. N.D. *Al-Baḥr al-rāʾiq, Sharh Kanz al-Daqāiq*. Beirut: Shirkah Alauddīn.

Islam, Kabedul. 2002. *Bangladesher Bhumirajassya Babostha*. Dhaka: Mowla Brothers.

Islam, Sirajul. 2013. *Banglar Itihas: Ouponibeshik Shashonkathamo*. Dhaka: Chayanica.

Jahangir, Khandakar Abdullah (2009). *Bangladeshe Ushar Ba Fosholer Jakat*. Jhenidah: As-Sunnah Publications.

Karim, Abdul (2014). *Social History of the Muslim Bengal*. Dhaka: Jatiya Sahitya Prakash.

Qanungo, Suniti Bhushan (1988). *A History of Chittagong*. Chittagong: Signet Library.

Qil‘ajī, Muhammad Rawwās. 1981. *Mawsuʿah Fiqh ‘Umar Ibn Al-Khattāb*. Kuwait: Maktabah al-Falāh.

Rahim, Muhammad Abdur (1963). *Social and Cultural History of Bengal*. Karachi: Pakistan Historical Society.

Renaudot, Eusebius (1733). *Ancient Accounts of India and China by two Mohammedan Travellers*. London: Sam. Harding.

Rubbee, Khondkar Fuzli Rubbee (1895). *The Origin of the Musalmans of Bengal*. Calcutta: Thacker, Spink and Co.

Shafī, Muftī Muhammad (1995). *Islame Bhumi Bybostha*. Dhaka: Islamic Foundation.

Shaikh Nizam [ed. (1310 H.)]. *Al-Fatawa Al-Alamkiriyyah*. Cairo: Bulaq.

Yaqūt al-Hamawi (1977). *Muʿjamul Buldan*. Beirut: Dār Sadir.

Zubair Mohammad Ehsanul Hoque (2020). “Fol-Fosoler Zaka Nirdharone Utpadon Khorocher Bhumika”. *Islami Ain O Bichar*. Vol. 16, Issue. 61.